গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭১ বর্ষ ৩৫ সংখ্যা ১২ - ১৮ এপ্রিল ২০১৯ প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর www.ganadabi.com আট পাতা মূল্য ঃ ২ টাকা

একই স্লোগান আপনার ঠাকুমাও দিয়েছিলেন

নির্বাচন ঘোষণা হতেই প্রতিশ্রুতির বন্যা বইতে শুরু করেছে দেশজুড়ে। জনগণের জন্য কে কী করবে, তাদের কত কিছু পাইয়ে দেবে— তার লম্বা ফিরিস্তি দিয়ে চলেছে ভোটবাজ রাজনৈতিক দলগুলি। এই প্রতিশ্রুতি বাস্তবে প্রলোভন ছাড়া আর কিছু নয়— যা এই দলগুলি প্রতি নির্বাচনে জনগণের ভোট টানতে রুটিন মাফিক দিয়ে থাকে।

নির্বাচনকে সামনে রেখে ইতিহাসের ডাস্টবিন থেকে কংগ্রেস আবার তুলে এনেছে গরিবি হঠাও-এর স্লোগান। বিজেপি নেতারা বুঝে গেছেন, 'সবার বিকাশ' কিংবা সবার জীবনে 'আচ্ছে দিন', একশো দিনে মূল্যবৃদ্ধি রোধ কিংবা বছরে দু'কোটি চাকরি বা কালো টাকা উদ্ধার করে সবার অ্যাকাউন্টে ১৫ লাখ টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি এবারের নির্বাচনে আর কাজ করবে না। তাই তাঁরা সরে গেছেন 'দেশরক্ষা'র স্লোগানে। তৃণমূলের মতো সব আঞ্চলিক দলগুলিও ভোট টানতে দেদার প্রতিশ্রুতি বিলোচ্ছে।

কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী বিজেপির মতোই শিক্ষা-স্বাস্থ্য-চাকরির ঢালাও প্রতিশ্রুতির পাশাপাশি বলেছেন, তাঁরা ক্ষমতায় এলে দেশের ৫ কোটি দরিদ্র পরিবারকে মাসে ৬ হাজার টাকা করে বছরে ৭২ হাজার টাকা দেবেন এবং এই ভাবে ২০৩০-এর মধ্যে দেশ থেকে দারিদ্র একেবারে নির্মূল করে দেবেন। দারিদ্র দূরীকরণের এই মহৌষধ নাকি তাঁর নির্দেশে ওস্তাদ সব বিশেষজ্ঞরা ছ'মাস ধরে অনেক মাথা খাটিয়ে আবিষ্কার করেছেন। রাহুল বলেছেন, 'একদিকে অনিল আম্বানির ভারত, অন্য দিকে গরিবের ভারত থাকবে না।' তিনি বলেছেন, 'একুশ শতকে দেশে এত লোক গরিব, সেটা কোনও ভাবেই মানা যায় না।'

কথাগুলি কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী বলেছেন— এটা না জানলে মনে হবে, কোনও দেবদূত বুঝি মানুষের দুঃখ দেখে তা দূর করতে হঠাৎ মর্ত্যে নেমে এসেছেন। কিন্তু গরিবদের কথা রাহুলের কখন মনে পড়ল? ঠিক নির্বাচনের সামনে এসে। নির্বাচন এলেই এই সব ভোটবাজ দলগুলির নেতাদের গরিব মানুষের কথা মনে পড়ে। গরিবি দূর করার তাড়নায় চোখ দিয়ে জল ঝরতে থাকে। ভোট চলে গেলে গরিবদের কথা আর মনেও থাকে না। কেউ জোর করে চেপে ধরলে বলেন, 'গরিব? দেশে আর গরিবি আছে নাকি? সে তো আমরা কবেই দূর করে দিয়েছি।' যেমন এ রাজ্যে তৃণমূল নেত্রী কিংবা কেন্দ্রে বিজেপি নেতারা বলছেন, তাঁরা প্রায় সব বেকারদেরই কাজ দিয়ে দিয়েছেন।

রাহুল গান্ধী কি হঠাৎ জানতে পারলেন যে একুশ শতকেও দেশে এত লোক গরিব? তিনি কি এতদিন জানতেন দেশে কোনও গরিব নেই, সবাই তাঁর পরিবারের মতো ধনী? তা হলে তো তিনি দেশ পরিচালনার যোগ্য ব্যক্তিই বটে! রাহুল গান্ধীর পরিবারই তো স্বাধীনতার পর থেকে চার দশক প্রায় টানা দেশ শাসন করেছে। একুশ শতকে দেশে তবু কেন এত গরিব থাকল, কেন ধনী-গরিবে এমন আকাশ-জমিন ফারাক হল— এই প্রশ্নের জবাব তো তাঁর এবং তাঁর পরিবারেরই দেওয়ার কথা। সেই জবাবাদিহি এড়িয়ে নির্বাচনের সামনে হঠাৎ গরিব-দরদি সাজার তাঁর উদ্দেশ্যটা কী? এটা তো চরম ভণ্ডামি! দেশের মানুষের সাথে আবার একটা বিরাট প্রতারণা!

দুয়ের পাতায় দেখুন

কমরেড প্রভাস ঘোষের 'জনস্বার্থে নির্বাচনকে কোন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে হবে' পুস্তিকাটির লক্ষ লক্ষ কপি দলের কর্মীরা হাট-বাজার-স্টেশন সর্বত্র মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন
ছবি ঃ দক্ষিণ কলকাতা, যদুবাবুর বাজার

কোনও কিছুতেই সিপিএম তার সুবিধাবাদী রাজনীতিকে আড়াল করতে পারছে না

আসন নিয়ে দ্বন্দ্বের জেরে এ রাজ্যে এবং সর্বভারতীয় স্তরেও সিপিএম-কংগ্রেস নির্বাচনী আঁতাত ভেস্তে গেলেও সিপিএম তার কংগ্রেস-প্রীতি অটুট রাখতে মরিয়া। এ রাজ্যের ৪২টি আসনের মধ্যে ৪০টিতেই দুই দল পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রার্থী দিয়েছে। খোদ কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী কেরালায় সিপিএমের বিরুদ্ধে প্রার্থী হয়েছেন। তিনি ওই রাজ্যে সিপিএমের বিরুদ্ধে প্রচার না করার কথা বললেও তাঁর দলের কর্মীরা ভালই বুঝছেন এর কোনও অর্থ নেই। কারণ ওই রাজ্যে সিপিএমকে প্রতিপক্ষ করেই কংগ্রেসকে ভোটে লড়তে হবে। এর পরেও বহরমপুর এবং মালদহ দক্ষিণ কেন্দ্রে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আসন না দেওয়ার কথা একতরফা ভাবে ঘোষণা করেছেন সিপিএম নেতারা। বহরমপুরে আরএসপি প্রার্থী দেওয়ার কথা ঘোষণা করায় অতি তৎপরতায় সিপিএম তা আটকানোর চেষ্টা করেছে। আরএসপি এ কথা শুনতে না চাওয়ায় তাদের সিপিএমের হুমকিও শুনতে হয়েছে। অপরদিকে মালদহ দক্ষিণ কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী আবু হাসেম খান চৌধুরীর হয়ে সিপিএম সরাসরি প্রচারে নেমেছে। বামমনস্ক মানুষদের প্রশ্ন, নিছক ভোটের কারণে এত কংগ্রেস প্রীতির আসল কারণটা কী? এর দ্বারা তো বামপন্থাকেই কলঙ্কিত করা হচ্ছে।

সিপিএম বলে যাচ্ছে, বিজেপি এবং তৃণমূলকে হারানোই তাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু এটাই যদি সত্যি হয়, তা হলে বাকি ৪০টি কেন্দ্রে তারা প্রার্থী দিল কেন? রায়গঞ্জ কেন্দ্রে সিপিএম প্রার্থী না দিলে কংগ্রেসের পক্ষে তো তৃণমূল বিজেপিকে অধিকতর বেগ দেওয়া সম্ভব হত। সেক্ষেত্রে

ছয়ের পাতায় দেখুন

কর্ণাটকের রায়চুর কেন্দ্রে দলের প্রার্থী কমরেড কে সোমশেখর-এর সমর্থনে মিছিল

কৃষক আত্মহত্যার মিছিল থামবে কবে?

দেনার দায়ে আবার আত্মহত্যা করলেন একজন ভাগচাষি। পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনা-১ নং ব্লকের বাখনাপাড়ার মাধব মাঝি বেসরকারি ব্যাঙ্ক ও মহাজনের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে এবং স্ত্রী- পুত্রবধূর গয়না বন্ধক রেখে এ বছর আলু চাষ করেছিলেন। মোট চার বিঘা ভাগ চাষের মধ্যে আড়াই বিঘাতে আলু ও দেড় বিঘাতে বোরো চাষ করেন তিনি।

এই মরসুমে আলুর ফলন ভাল হলেও, আলু ওঠার মুখে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে তাঁর ৭০ শতাংশ আলু নষ্ট হয়। বাকি ৩০ শতাংশ আলু ১২০-১৩০ টাকা বস্তা অর্থাৎ মাত্র ২ টাকা থেকে ২.৫০ টাকা কেজি দরে বিক্রি করতে বাধ্য হন তিনি। চাষের জন্য যে বিপুল পরিমাণ টাকা মাধব মাঝি ঋণ করেছিলেন তা আলু বক্রি করে পাওয়া সামান্য টাকায় পরিশোধ করা আর তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি।

মূলত ঋণের দায়েই আত্মহত্যা করেছেন বাবা— বলে অভিযোগ করেছেন তাঁর ছেলে অজিত মাঝি। অথচ স্বভাবসিদ্ধ ভাবেই রাজ্য সরকার মৃত্যুর কারণ 'পরিষ্কার নয়' বলে জানিয়েছে। আসলে এই মৃত্যুর দায় ভোটের মুখে স্বীকার করতে নারাজ সরকার ও প্রশাসন।

স্বীকার করবেই বা কেন? কিছু দিন আগেই তো ১০ লক্ষ মেট্রিক টন আলু কৃষকদের কাছ থেকে ৫.৫০ টাকা কেজি দরে সরাসরি কেনার কথা ঘোষণা করেছিলেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী। শুধু তাই নয়, কৃষকদের হাতে নগদ ৫ হাজার

দুয়ের পাতায় দেখুন

একই স্লোগান

একের পাতার পর

রাহুল গান্ধী যে প্রতিটি গরিব পরিবারকে মাসে ছ'হাজার টাকা করে দেবেন বলেছেন, তা তিনি কোথা থেকে দেবেন? তাঁর পারিবারিক সম্পদ থেকে তো নয়, দেশের মানুষের অর্জিত সম্পদই তো তাদের ভিক্ষার মতো ছুঁড়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন! প্রথম কথা, পূর্বতন কংগ্রেস-বিজেপি প্রতিটি সরকারের মতো, তিনিও যদি ক্ষমতায় আসেন, তবে এই প্রতিশ্রুতির কথা ভুলতে তাঁর মুহূর্ত সময় লাগবে না। তাঁর মধ্যে দেশের মানুষ এমন কিছু দেখেনি, যাতে তাঁকে তাঁর পূর্বসূরিদের থেকে অন্য রকম বলে তাদের মনে হতে পারে। দ্বিতীয়ত, এর জন্য কত টাকা লাগবে, সেই টাকা কোন খাত থেকে আসবে, আদৌ তা বাস্তবসম্মত কি না ইত্যাদি তর্কে না গেলেও, রাহুলবাবু কি মনে করেন, মাসে ছ'হাজার টাকা করে পেলে গরিব পরিবারগুলির গরিবি দূর হয়ে যাবে? সবাই জানে, তা আদৌ দূর হবে না। তা হলে তিনি এমন প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন কেন?

এই ভিক্ষা তো দেশের মানুষ রাহুলবাবুর কাছে, কিংবা কোনও সরকারের কাছে চায়নি। অমর্যাদাকর এই ভিক্ষার দান নয়, স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসাবে প্রত্যেকে চায় নিজের পরিশ্রমে মর্যাদার সাথে বাঁচতে। রাহুলবাবু সত্যিই দারিদ্র দূর করতে চাইলে প্রত্যেকের জন্য মর্যাদাকর কাজের ব্যবস্থা করার কথা বলছেন না কেন? সবার আগে তিনি দেশের মানুষকে বলুন, স্বাধীনতার বাহাত্তর বছরেও বেশির ভাগ মানুষ কেন সেই মর্যাদার জীবন পেল না? কোথায় তা আটকাল? ভারতের মতো একটি দেশে, যেখানে রয়েছে সমস্ত রকমের প্রাকৃতিক সম্পদের অফুরন্ত ভাণ্ডার, সেখানে মানুষ কেন প্রজন্মের পর প্রজন্ম গরিব থাকে? দেশের অধিকাংশ মানুষ যখন ক্রমাগত আরও গরিব হয়ে চলেছে তখন মুষ্টিমেয় মানুষের সম্পদের পাহাড় কী করে আকাশ ছুঁয়ে ফেলছে? কী করে ৯৯ শতাংশ দরিদ্রের বিপরীতে ১ শতাংশ অনিল আম্বানিদের ভারত তৈরি হল? অর্থাৎ গরিবির কারণ কী এবং তার সমাধান তিনি কীভাবে করতে চান তা আগে তিনি দেশের মানুষের সামনে স্পষ্ট করে রাখুন। তা কিন্তু তিনি বলছেন না। অর্থাৎ গরিবির কারণটিকে তিনি দেশের মানুষের কাছে গোপন করে যাচ্ছেন। কেন গোপন করছেন? কারণ তা সামনে এসে গেলে তাঁর বা তাঁর মতো রাজনীতি ব্যবসায়ীদের আর গরিব-দরদি সাজা হয় না। মানুষের গরিবির কারণ যে তাদের ভাগ্য বা পূর্বজন্মের পাপের ফল নয়, শোষণমূলক এই পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থাই প্রতি দিন প্রতি মুহূর্তে জনগণের পরিশ্রমের সমস্ত ফসল লুঠ করে পুঁজিপতিদের ভাণ্ডারে জমা করে গরিবির জন্ম দিয়ে চলেছে, প্রতিদিন অসংখ্য মানুষকে গরিবিতে টেনে নামাচ্ছে— এই সত্যটিকেই রাহুলবাবুরা, মোদিবাবুরা, মমতাদেবীরা, সব রাজনীতির ব্যবসায়ীরা জনগণের থেকে আড়াল করতে চান। তাঁরা শোষণমূলক এই সমাজব্যবস্থাকে অটুট রেখে, বরং তার সেবা করার দায়িত্ব নিয়ে গরিবদের জন্য শুধু কিছু খয়রাতি করতে চান। এর নাম দিয়েছেন তাঁরা দারিদ্র দূরীকরণ! আসলে রাহুলবাবুরা সত্যিই দেশের মানুষের গরিবি দূর করতে চান না। তাঁরা চান মানুষকে গরিব রেখেই তাদের গরিবি নিয়ে ভোটের রাজনীতি করতে আর ভোটের সময় গরিব দরদি সেজে মানুষকে ভুলিয়ে ক্ষমতার মসনদ দখল করতে। তাঁরা চান গরিব মানুষকে মাঝে মাঝে এমনই কিছু ভিক্ষের খুদ-কুঁড়ো ছুড়ে দিয়ে তাদের ক্ষোভটাকে স্তিমিত করতে। তাঁরা যে রাজনীতি করেন, সেই রাজনীতি কখনও গরিবি দূর করতে পারে না। অসহায় অসচেতন মানুষকে সুখের আশার কথা শুনিয়ে বাস্তবে তাঁরা পুঁজিবাদী শোষণটাকে আড়াল করতে চান। এই আড়াল করাটাই তাঁদের রাজনীতি। এই ভাবেই তাঁরা শোষক শ্রেণির বিশ্বস্ত প্রতিনিধি তথা রাজনৈতিক ম্যানেজার হিসাবে কাজ করে চলেছেন।

রাহুলবাবু নিশ্চয়ই জানেন, তাঁর ঠাকুমা ইন্দিরা গান্ধী আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে ১৯৭১ সালে ঠিক তাঁরই মতো নির্বাচনের আগে গরিবি হঠাও-এর ডাক দিয়ে গরিব মানুষের কাছে ভোট চেয়েছিলেন। সরকারের ধামাধরা সংবাদমাধ্যম তখন তাঁকে গরিবের মা-বাপ বলে প্রচার করতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। কিন্তু গরিবির গায়ে তিনি আঁচড়ও কাটতে পারেননি। বরং তাঁর শাসনেও আরও অজস্র মানুষ গরিবির অন্ধকারে তলিয়ে গেছে। রাহুল গান্ধী তো তাঁর ঠাকুমা কিংবা তাঁরও বাবা জওহরলালের থেকে আলাদা কোনও নীতির কথা ঘোষণা করেননি। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও তাঁর শাসনে একজন কালোবাজারিকেও ল্যাম্পপোস্টে ঝোলাতে পারেননি। বরং, কালোবাজারি, মজুতদার, একচেটিয়া পুঁজির মালিকরাই দেশের কোটি কোটি মানুষকে বেকারি, মূল্যবৃদ্ধি, অনাহারের ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে চলেছে। এই অবস্থার সত্যিই পরিবর্তন চাইলে দাঁড়াতে হবে গরিবির জন্মদাতা এই শোষণমূলক, মুনাফাভিত্তিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। রাহুলবাবু কংগ্রেসের নেতা হিসাবে তো পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারেন না। তাই তাঁদের মুখে গরিবি দূর করার প্রতিশ্রুতি শুধুমাত্র অসহায় অসচেতন মানুষকে ভুলিয়ে ভোটে জিতে মন্ত্রী হওয়ার জন্য, শাসক হওয়ার জন্য। এই জন্যই শাসক শ্রেণি কখনও চায় না দেশের সাধারণ মানুষ শিক্ষার সুযোগ পাক, সচেতন হোক। জনতার অজ্ঞতাই যে শাসক শ্রেণির আসল শক্তি রাহুল গান্ধী, নরেন্দ্র মোদিদের আচরণ বারবার তা প্রমাণ করছে।

পুঁজিপতি শ্রেণির আর এক একনিষ্ঠ সেবক বিজেপির নেতারা গত পাঁচ বছরে দেশের মানুষের কাছে ধরা পড়ে গেছেন। তাঁদের সব প্রতিশ্রুতিই যে ভুয়ো, তাঁদের শাসনে যে জনগণ নয়, পুঁজিপতিদেরই আচ্ছে দিন এসেছে তা দেশের অধিকাংশ মানুষের কাছে আজ স্পষ্ট। তাই জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলির সমাধানের কথা বিজেপি নেতারা এবার এড়িয়ে চলছেন। তাঁরা এবার দেশপ্রেমের ধুয়ো তুলছেন, দেশরক্ষার ঠিকেদারি ঘোষণা করছেন। পুলওয়ামায় জওয়ানদের মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনায় যখন দেশের মানুষ প্রশ্ন তুলতে থাকল, কেন আগাম সতর্কতা সত্ত্বেও সরকার জওয়ানদের প্রাণ রক্ষার ব্যবস্থা করল না, এত বিপুল পরিমাণ আরডিএক্স বিস্ফোরক কোথা থেকে এল, তখন মানুষের দৃষ্টি ঘোরাতে পাকিস্তানে জঙ্গি ঘাঁটি ভাঙার গল্প শুরু হল। বিজেপি নেতারা বুঝে গেছেন, এই গল্পের রেশও বেশিদিন থাকবে না। তাই প্রধানমন্ত্রী উপগ্রহ ধ্বংসের নতুন গল্প ফেঁদেছেন। দেশের কোটি কোটি মানুষ বেকারি, মূল্যবৃদ্ধি, অশিক্ষা, চিকিৎসাহীনতার জ্বালায় ছটফট করছে। তাদের জীবনে আচ্ছে দিন আনার প্রতিশ্রুতি দিয়েই ক্ষমতায় বসেছিল বিজেপি। সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ করার কথা এড়িয়ে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী এখন উপগ্রহ ধ্বংসের গল্প শোনাচ্ছেন। কেন তিনি বলতে পারলেন না, গত পাঁচ বছরে আমরা এমন শাসন কায়েম করেছি যাতে মূল্যবৃদ্ধির উপর, বেকারির উপর, অজ্ঞতার উপর, মানুষের দ্বারা মানুষের উপর শোষণের বিরুদ্ধে নিখুঁত আক্রমণ হানতে পেরেছি? বিজেপি নেতারা দেশরক্ষা বলতে কি শুধু দেশের মাটিকে রক্ষা করা বোঝেন? দেশ মানে তো আসলে দেশের মানুষ। তাদের মানুষের মতো বাঁচার ব্যবস্থা না করে তাঁরা কোন দেশরক্ষা করতে চান? আসলে তাঁদের পাঁচ বছরের শাসনের চরম জনবিরোধী ভূমিকা ভোলাতেই এই সব আজগুবি গল্প ফাঁদতে হচ্ছে।

বাস্তবে কী বিজেপি, কী কংগ্রেস— মিথ্যা প্রতিশ্রুতির প্রতারণা ছাড়া দেশের মানুষকে এইসব ভোটবাজ দলগুলির আর কিছু দেওয়ার নেই। স্বাধীনতার পর গত বাহাত্তর বছরের ইতিহাস তাই দেশের মানুষের সাথে শাসক দলগুলির প্রতারণার ইতিহাস। গণতন্ত্রের নামে এই নির্বাচন আসলে আগামী পাঁচ বছর দেশের সম্পদ কারা লুঠ করবে, সেই কাজে শোষক পুঁজিপতি শ্রেণির পলিটিক্যাল ম্যানেজার হিসাবে কারা কাজ করবে তারই এক বুর্জোয়া প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় সাধারণ মানুষের কোনও স্বার্থ নেই। নির্বাচনের দ্বারা এই শোষণ-লুঠতরাজ বন্ধ হবে না। তা বন্ধ করতে সাধারণ মানুষকে সংগঠিত শক্তির জন্ম দিতে হবে, যা তাদের নিজস্ব দাবিকে সামনে রেখে দেশব্যাপী এক বিরাট গণআন্দোলনের জন্ম দেবে। সেই গণআন্দোলনের শক্তিই বদলে দেবে শোষণমূলক এই ব্যবস্থাকে। কায়েম করবে জনগণের নিজেদের শাসন।

শ্রীরামপুর টাউন হল। ৫ এপ্রিল এ আই ইউ টি ইউ সি-র ডাকে এস ইউ সি আই (সি) প্রার্থীদের সমর্থন করার আহ্বান জানিয়ে শ্রমিক সভা। বক্তব্য রাখছেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সম্পাদক কমরেড শংকর সাহা। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। উপস্থিত ছিলেন শ্রীরামপুর, হুগলি ও আরামবাগ কেন্দ্রের প্রার্থী কমরেডস প্রদ্যোৎ চৌধুরী, ভাস্কর ঘোষ এবং প্রশান্ত মালিক।

জীবনাবসান

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার ৪ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা ও জয়নগর পৌরসভার পূর্বতন লোকাল কমিটির সদস্য কমরেড মিহির সরকার ৩১ মার্চ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে নিজ গৃহে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। তিনি বিগত দেড় বছর যাবৎ অসুস্থ অবস্থায় ছিলেন।

গত শতকের '৬০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে তিনি দলের সঙ্গে যুক্ত হন। তারপর থেকে যতদিন সক্ষম ছিলেন দলের একজন সৎ ও নিষ্ঠাবান কর্মী হিসাবে কাজ করে গেছেন। প্রবল আর্থিক অনটন সত্ত্বেও কোনও প্রলোভন তাঁকে দলের আদর্শ থেকে চ্যুত করতে পারেনি। তিনি দলের মুখপত্র গণদাবী নিয়মিত বিক্রি করা, বৃত্তি পরীক্ষার পরীক্ষার্থী সংগ্রহ করা এবং অন্যান্য কর্মসূচিতে নিষ্ঠার সঙ্গে অংশ নিতেন। তাঁর প্রয়াণে দল একজন সৎ, নিষ্ঠাবান গরিব দরদি কর্মীকে হারাল।

কমরেড মিহির সরকার লাল সেলাম

কৃষকের আত্মহত্যা

একের পাতার পর

টাকা করে পৌঁছে দেওয়ার কথাও ঘোষণা করেন তিনি। তার পরেও এই মৃত্যু? ভোটের মুখে তৃণমূলের পক্ষে এই মৃত্যু প্রকাশ্যে আনা কী সম্ভব?

বিচার করলেই বোঝা যায়, এ রাজ্যে চাষিদের পাশে দাঁড়ানোর নামে সরকার যা যা নীতি গ্রহণ করেছে সেগুলি সবই ভাঁওতা। ভোটের দিকে তাকিয়ে চাষিদের ঠকানো হয়েছে। চাষির হাতে নগদ টাকা গুঁজে দেওয়া বা এ বছর উৎপাদিত ২ কোটি ৭০ লক্ষ মেট্রিক টন আলুর মধ্যে মাত্র ১০ লক্ষ মেট্রিক টন কিনলে চাষির সমস্যার যথার্থ কোনও সমাধান যে সম্ভব নয়, তা সরকার জানে। কিন্তু ভোটের মুখে এই ধরনের ঘোষণা যে তৃণমূলের ঝুলিতে কিছু বাড়তি ভোট এনে দিতে পারে, সেটাও তারা ভালই জানে।

ফলে কৃষি নীতির কোনও পরিবর্তন না করে, লম্বা-চওড়া প্রকল্প ঘোষণাতেই তাদের বেশি মনোযোগ। আবার যে প্রকল্পের ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী করছেন তাতে, ভাগচাষিদের বিশেষ সুবিধা হওয়ার কথা নয়। যে চাষির নিজের নামে জমি রয়েছে এবং কাগজপত্র রয়েছে তাঁরাই এই সুযোগ পাবেন। বাকিদের অধিকার অনিশ্চিতই থেকে যাবে। ভাগচাষি বা প্রান্তিক চাষিদের চাষের জন্য গ্রামীণ মহাজনদের কাছ থেকে চড়া সুদে ঋণ করা ছাড়া কোনও উপায় নেই। আবার সরকারি সহায়ক মূল্যেও এরা ফসল বিক্রি করতে পারবে না। ফলে ফসল বিক্রি করতে হবে গ্রামীণ ফড়ে বা আড়তদারদের কাছে— তাদের বেঁধে দেওয়া দামে, যা থেকে ঋণ পরিশোধ করা তো দূরের কথা চাষের খরচটুকুও ওঠা সম্ভব নয়।

ফলত চাষির আত্মহত্যা ছাড়া দ্বিতীয় কোনও রাস্তা নেই। বিগত সাত বছরে এ রাজ্যে প্রায় ২০০ কৃষক আত্মহত্যা করেছেন। সিপিএম জমানাতেও এই জিনিস ঘটেছিল। অন্য রাজ্যগুলিতে একই দুরাবস্থা। দেশজুড়েই চলছে কৃষক আত্মহত্যার মিছিল। বিজেপি-কংগ্রেস বা এ রাজ্যের তৃণমূল ও পূর্বতন সিপিএম সহ সমস্ত ভোটবাজ দলগুলির করপোরেট কোম্পানির স্বার্থবাহী কৃষিনীতির বেড়াজাল ছিন্ন করতে চাই ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ আন্দোলন। একমাত্র এই রাস্তাতেই এ রাজ্যে তথা দেশের লক্ষ লক্ষ চাষির আত্মহত্যা করতে বাধ্য হওয়ার ঘটনা বন্ধ হতে পারে।

নির্বাচনেও বুর্জোয়া প্রলেতারিয়েতের শ্রেণিগত পার্থক্য থাকে

আগামী ২৪ এপ্রিল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর ৭১তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী। দেশব্যপী এখন নির্বাচনী প্রচার চলছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে দলের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক, এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের একটি বক্তৃতার অংশবিশেষ এখানে প্রকাশ করা হল।

রাজনীতি করা একটা জিনিস, আর রাজনীতি সঠিক কি বেঠিক, সেটা বোঝবার চেষ্টা করা এবং সেই অনুযায়ী কোন রাজনৈতিক লাইন ধরে চলব তা ঠিক করা আর এক জিনিস। সেটা ঠিক করলেই কারওর রাজনীতি করতে হয় না। অথচ সেটা ঠিক না করলে কোনও লড়াই, কোনও মানবিক লড়াই আজকের দিনে হতে পারে না, কোনও সংগঠনই দানা বাঁধতে পারে না। ফলে এ দুটো জিনিস তাদের কাছে পরিষ্কার হওয়া দরকার। তাদের বলা দরকার, এত ভয় পাচ্ছ কেন? পার্টি পলিটিক্সের কথা শুনলে এত ভয় পেয়ে যাও কেন? জোর করে কাউকে পার্টি করানো যায় কি? বিপ্লবী পার্টি তো করানো যায়ই না। যতক্ষণ না বুঝছ, তোমার উদ্বিগ্ন হবারও প্রয়োজন নেই, দরকারও নেই। কিন্তু একটি জিনিস অবশ্যই দরকার, তা হল, রাজনীতি তোমাকে বুঝতেই হবে। তুমি যদি বল, না, না, রাজনীতি বোঝবার দরকার নেই, তা হলে তুমি না বুঝলেও, রাজনৈতিক স্থিতি এবং চিন্তাভাবনা, যা ভুল, তা যদি দেশে চলতে থাকে এবং তার প্রভাব যদি বাড়তে থাকে তা হলে, যে তুমি রাজনীতি থেকে গা বাঁচাতে চাইছ, সেই তুমি তোমার চিন্তা-ভাবনা, রুচি, সংস্কৃতি, পরিবার এমনকী যে সংগঠনটি তোমরা এখানে খাড়া করতে চাও, সে সবই তো সেই ভুল রাজনীতির প্রভাবে বরবাদ হয়ে যাবে। তাকে তুমি রক্ষা করতে পারবে? এভরি মুভমেন্ট ইজ ইনফ্লুয়েন্সড বাই পলিটিক্স, প্রতিটি আন্দোলনই রাজনীতির দ্বারা প্রভাবিত। তার প্রভাব থেকে খাদ্য থেকে শুরু করে সব কিছু, মেডিসিন পর্যন্ত মুক্ত নয়— আপনি নিজেকে আলাদা রাখবেন কী করে? ইউ আর এ সোস্যাল বিয়িং (আপনি সামাজিক সত্তাবিশিষ্ট মানুষ)। সংগঠনের কথা তো বহু দূর, এর একটি ব্যক্তি মানসিকতা পর্যন্তও তার থেকে মুক্ত রাখার উপায় নেই। আপনি ভাবতে পারেন, আমি আলাদা থাকব, এ সম্পর্কে আপনি অনবহিত থাকতে পারেন। আপনার চিন্তা-ভাবনা এরকম থাকতে পারে যে, আমি কারওর সঙ্গে, কারওর সংস্পর্শে নেই। এর মানে হল আপনি অনবহিত। আপনি জানেন না কীভাবে আপনি সমাজের সঙ্গে প্রতিনিয়তই সম্পর্কিত হচ্ছেন, কীভাবে বর্তমান রাজনৈতিক পরিবেশ আপনার মানসিকতার উপর প্রভাব বিস্তার করছে, আপনার সংগঠনের মানসিকতার উপর প্রভাব বিস্তার করছে, সংগঠন পরিচালনার কায়দার উপর প্রভাব বিস্তার করছে। এই যেটাকে বলছেন, স্টাইল অব অর্গানাইজেশন, সংগঠন পরিচালনার পদ্ধতি বা কৌশল, এই স্টাইল অব অর্গানাইজেশন কথাটার মধ্যেও বুর্জোয়া ভাবনা-ধারণা, প্রোলেটারিয়েটের বিপ্লবী ভাবনা-ধারণা প্রতিফলিত হয়।

যেমন ধরুন একটা ইলেকশন এসে গেছে, তার লড়াই লড়বেন। আপনি ভাবছেন— এটা নির্বাচন, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়ছেন, এর মধ্যে আবার বিপ্লবী রাজনীতির কী আছে? আপনার ধারণা হচ্ছে, কংগ্রেসকে পরাস্ত করার যে কোনও কৌশলটাই বিপ্লবী। না, তা নয়। ইলেকশনে কংগ্রেস একটা পক্ষ, বিপক্ষ দল আর একটা পক্ষ, তার মধ্যে জনসাধারণ এসে যাচ্ছে।

যতদিন বিপ্লব না হয়, জনতা ইলেকশন চাক বা না চাক, পছন্দ করুক আর নাই করুক, ভাল লাগুক, মন্দ লাগুক, জনতাকে টেনে আনা হয়, জনতা এসে যায়। বিপ্লব মানে হল, যখন জনতা বুঝে ফেলেছে ইলেকশনের প্রয়োজনীয়তা নেই, যখন সকলে এই চেতনার ভিত্তিতে সংগঠিত হয়ে গেছে এবং সংগঠিত ভাবে ইলেকশন বর্জন করছে, নেগেটিভলি বর্জন করছে না, পজিটিভলি তারা গণঅভ্যুত্থান করার জায়গায় চলে গেছে, যখন সে বলে, না ইলেকশন নয়, ক্ষমতা দখল, তখনই একমাত্র ইলেকশন অকার্যকরী হতে পারে, না হলে ইলেকশনে জনতা বার বার ফেঁসে যায়। আর জনতার সঙ্গে থাকবার জন্য বিপ্লবী হোক, অবিপ্লবী হোক সকলকেই ইলেকশনে যেতে হয়, সত্যিকারের বিপ্লবীকেও যেতে হয়। শুধু ঐসব সেকটেরিয়ান ট্রুইজম-এর চর্চা যারা করে, যারা বিপ্লবের চর্চা করে না, তারা গা বাঁচায়, না হলে সকলকেই যেতে হয়। তা হলে গেলে সকলের কি দৃষ্টিভঙ্গি এক হবে? ইলেকশন তো সকলেই করছে, বাইরের দিক থেকে দেখলে, আমি করছি, বিপ্লবী লেনিনবাদীরা করছি, সোস্যাল ডেমোক্র্যাটরাও করছে, খাঁটিরাও করছে, মেকিরাও করছে, বুর্জোয়ারাও করছে, মেকি সমাজতন্ত্রীরাও করছে। আর সকলেরই কথা হবে আমি ঠিক, বিপক্ষ দল বেঠিক। তা হলে বিপক্ষ দলকে হারাবার জন্য যে কোনও কৌশলটাই হচ্ছে সঠিক, কারণ আমি সঠিক। এইভাবে যদি আপনি যুক্তি করতে থাকেন, তা হলে বুর্জোয়া আর আপনার মধ্যে কোনও শ্রেণিগত পার্থক্য থাকে না, দৃষ্টিভঙ্গিরও পার্থক্য থাকে না, অথচ গভীর বিচার-বিশ্লেষণে এটা ভুল প্রমাণ হয়।

আসলে বুর্জোয়া আর প্রোলেটারিয়েট এ দু'জনেরই লড়াইয়ের কলা-কৌশল, কায়দা, সংগঠন পদ্ধতি, ইলেকশন সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গি, জেতা-হারার কলা-কৌশলটি ঠিক করাও দেশের বাস্তব বিপ্লবী আন্দোলন, গণচেতনার স্তরের ভিত্তিতেই নির্ধারিত হয়। বুর্জোয়ার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যেন তেন প্রকারেণ সর্বোচ্চ সংখ্যক নির্বাচনী আসন দখল করা এবং করে ক্ষমতায় যাওয়া। ক্ষমতায় গিয়ে নানা রিফর্মস (সংস্কারমূলক কাজ) করে, নানা স্লোগান তুলে এই এগজিসটিং সিস্টেম-কেই (বর্তমান ব্যবস্থা) টিকিয়ে রাখা। যেমন করে বললে আমি জনতার মধ্যে প্রগতিশীল সেজে কিছুদিন তাকে বিভ্রান্ত করতে পারি, বোকা বানাতে পারি এবং এই ব্যবস্থাটাকেই দীর্ঘস্থায়ী করতে পারি— এ হল তাদের উদ্দেশ্য। তাহলে তার মূল লক্ষ্য হয়, যেভাবেই হোক সর্বাধিক নির্বাচনী আসন দখল কর। এটা ছাড়া রাজনৈতিক কর্মসূচি, আশু কর্মসূচি এগুলোও সে দেয়। এই প্রোগ্রাম ও স্লোগান তাদের যাই হোক, তাদের মূল কথা হচ্ছে, গ্র্যাব ম্যাক্সিমাম সিটস।

যতদিন বিপ্লব না হয়, জনতা ইলেকশন চাক বা না চাক, পছন্দ করুক আর নাই করুক, ভাল লাগুক, মন্দ লাগুক, জনতাকে টেনে আনা হয়, জনতা এসে যায়। বিপ্লব মানে হল, যখন জনতা বুঝে ফেলেছে ইলেকশনের প্রয়োজনীয়তা নেই, যখন সকলে এই চেতনার ভিত্তিতে সংগঠিত হয়ে গেছে এবং সংগঠিত ভাবে ইলেকশন বর্জন করছে, নেগেটিভলি বর্জন করছে না, পজিটিভলি তারা গণঅভ্যুত্থান করার জায়গায় চলে গেছে, যখন সে বলে, না ইলেকশন নয়, ক্ষমতা দখল, তখনই একমাত্র ইলেকশন অকার্যকরী হতে পারে, না হলে ইলেকশনে জনতা বার বার ফেঁসে যায়। আর জনতার সঙ্গে থাকবার জন্য বিপ্লবী হোক, অবিপ্লবী হোক সকলকেই ইলেকশনে যেতে হয়, সত্যিকারের বিপ্লবীকেও যেতে হয়।

আর বিপ্লবী উদ্দেশ্যমুখীনতার লক্ষ্য থেকে প্রোলেটারিয়েট যখন অনন্যোপায় হয়ে জনতার সঙ্গে থাকার জন্য নির্বাচনী লড়াইয়ে যায়, তখন সে একটা জনতার বিপ্লবী রাজনৈতিক লাইনের ভিত্তিতে যায়। সিট জেতবার জন্য সেও চেষ্টা করে সাধ্যমতো। কিন্তু তার উদ্দেশ্যের কেন্দ্রবিন্দুটা কখনই যেভাবেই হোক সর্বাধিক আসন দখল করা হয় না। তার মেইন ফোকাল পয়েন্টটা হয়, পিপলকে, জনতাকে, একটা মাস রেভোলিউশনারি লাইনের (জনতার বিপ্লবী রাজনৈতিক লাইনের) ভিত্তিতে ইলেকশন লড়াই করতে শেখানো এবং এইটা করতে গিয়ে ম্যাক্সিমাম সিট পাই পাব, যদি না পাই, একটাও না পাই, না পাব। যদি দশটা রক্ষা করতে পারি, দশটাই করব, কিন্তু তার সেন্ট্রাল ফোকাল পয়েন্ট কখনই হবে না— যে কোনও উপায়ে কতকগুলো সিট দখল করা।

জনতার সেই বিপ্লবী রাজনৈতিক সংগ্রামের পদ্ধতিটি কী, যেটা ইলেকশনে জনসাধারণের কাছে আমি নিয়ে যাব? জনতার মধ্যে আমি যাব এই কথা নিয়ে— তুমি যখন ইলেকশন করছই তখন পিপলের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তোমাকে বিপ্লবী রাজনীতির ভিত্তিতে ইলেকশন করতে হবে। সেটা করতে গিয়ে তোমার নিজের ঘাঁটিগুলি তুমি নিজে সামাল দাও। যে কয়টা সিট পাও, যতগুলো ম্যাক্সিমাম পার, এমনকী যদি সব সিটই জিততে পার, এর ভিত্তিতে এই লাইনের ভিত্তিতেই জেত। কিন্তু একমাত্র এর ভিত্তিতেই, এটাকে গোলমাল করে দিয়ে নয়। শত্রুকে হারাবার জন্য যা দরকার তাই কর— এসব যুক্তি যদি তুমি তোল, আর বিপ্লবী তকমা এঁটে তোল, তা হলে কিন্তু বুর্জোয়ারা যেভাবে ইলেকশন ফাইট করে, তুমিও আসলে সেই কৌশলটি, সেই কায়দাটি এবং সেই একই ট্যাকটিক্সটাকেই বিপ্লবের নামে চালু করার চেষ্টা করবে। এতে কি বিপ্লবী হওয়া যায়? এর দ্বারা কি বিপ্লবের কাজ এগোয়? না, এতে বিপ্লবী হওয়া যায় না এবং এর দ্বারা বিপ্লবী কাজও এগোয় না। এর ফলে, আমরা যে বলি ইলেকশনের মধ্য দিয়ে বুর্জোয়া পার্লামেন্টারি পলিটিক্সকে এক্সপোজ করব, তা হয় কি? এই কথাটা মুখে বলা আর কাজে করা এক জিনিস নাকি? একদল শুধু মুখে বলে, আর একদল বাস্তবে করে। কাজেই কারা এটা শুধু মৌখিকভাবে বলছে, আর কারা প্রকৃতই সেই অনুযায়ী কাজ করছে, এ সম্পর্কে পিপলকে, জনতাকে রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করাটাই হল আসল জিনিস।

যেমন আন্দোলনের ক্ষেত্রে ঐক্যের কথা সকলেই বলছে, কিন্তু কে শুধু বলছে আর কে ঐক্যের জন্য যা যা করা দরকার সেই অনুযায়ী কাজ পারুক না পারুক করছে, সেটা জনসাধারণকে দেখান। দেখান আর একদল ঐক্যের কথা বলছে কিন্তু বাস্তবে করছে যা, সেটি ঐক্য বিনষ্ট করা ছাড়া আর কিছু নয়। আর জনসাধারণকে এ কথাটি বোঝান, দুটো জিনিসের জন্যই ঐক্য তোমার দরকার। নিজের সংগঠনকে জোরদার করার জন্য ঐক্য দরকার, আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য ঐক্য দরকার। আবার ঐক্য দরকার বিপ্লবী রাজনীতিকে পরিষ্কার করার জন্য, মেকি রাজনীতি থেকে মোহমুক্তি ঘটাবার জন্য।

সমাজে মোহমুক্তি ঘটাবার প্ল্যাটফর্ম অব অ্যাকশন দরকার, ফলে ঐক্য দরকার। কিন্তু এই ঐক্য নীতি বিসর্জন দিয়ে নয়, সংগ্রাম বর্জন করে নয়। ঐক্যের মধ্যে আদর্শের সংগ্রামের স্বীকৃতি চাই। যারাই ঐক্যের মধ্যে আদর্শের সংগ্রামকে ঐক্যবিরোধী কাজ বলে তারাই শেষ পর্যন্ত ঐক্য নষ্ট করে। ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের দোহাই দিয়ে আদর্শ কমপ্রোমাইজ করলে সে ঐক্য থাকে না। সে ঐক্যের একটিই মানে— আদর্শ বিসর্জন দিয়ে কোনও একজনের পদলেহন করা। তা না হলে, ঐক্যের মধ্যে যে সংগ্রাম রয়েছে, সেটিকে জনতার সামনে তুলে ধরতে হবে। সেটিকে তুলে ধরে ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত উদ্যোগ নিয়ে আর স্বচ্ছ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আপনাদের গণসংযোগ বাড়িয়ে যেতে হবে, পিপলস ইনস্ট্রুমেন্ট অব স্ট্রাগল, জনতার নিজস্ব লড়াইয়ের হাতিয়ার গড়ে তুলতে হবে, আর তারই মধ্য দিয়ে পিপলস পলিটিক্যাল পাওয়ার, জনগণের রাজনৈতিক ক্ষমতা গড়ে তুলতে হবে। এ যদি করে যেতে পারেন তবে বিপ্লব একদিন আসবেই, ইতিহাসের অমোঘ নিয়ম কেউই ঠেকাতে পারবে না, আপনাদের ইনকিলাবের স্বপ্ন একদিন সফল হবেই।

লোকাল ট্রেনে প্রচারে কাঁথি লোকসভা কেন্দ্রের এস ইউ সি আই (সি) প্রার্থী

কাঁথি লোকসভা কেন্দ্রে এস ইউ সি আই (সি) প্রার্থী মানস প্রধান শনিবার দীঘা-পাঁশকুড়া লোকাল ট্রেনে প্রচার করলেন। কমরেড মানস ট্রেনের প্রতিটি কামরা ঘুরে ঘুরে যাত্রীদের কাছে দলের বক্তব্য পৌঁছে দেন। এস ইউ সি আই (সি) এবার রাজ্যের ৪২টি আসনেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। জনজীবনের সমস্যা সমাধানে আন্দোলনকে শক্তিশালী করতেই দল নির্বাচনে লড়ছে বলে জানান মানস। প্রচারে তিনি বলেন, নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার বদল হয় কিন্তু গরিব-খেটে খাওয়া মানুষের মৌলিক সমস্যার সমাধান হয় না। আমাদের লড়াই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে দিন বদলের লড়াই। ভোটের মাধ্যমে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা পাল্টায় না। আমরা চাই গণআন্দোলনের মধ্য দিয়ে মালিকি ব্যবস্থার উচ্ছেদ। নির্বাচনী প্রচারে দলের রাজনীতির কথাটাই বেশি করে নিয়ে যাচ্ছি। পাশাপাশি হরিপুরে পরমাণুবিদ্যুৎ কেন্দ্র বাতিল, দই সায়ের কামার শিল্পের ও রামনগরের কাঁসা শিল্পের পুনরুজ্জীবন, দীঘা-পাঁশকুড়া লোকাল ট্রেনের সংখ্যা বাড়ানো এবং ডবল লাইন চালু সহ কর্মসংস্থানের দাবিতে দীঘা, শংকরপুর, মন্দারমণি, জুনপুট সহ কোস্টাল এলাকায় মৎস্যজীবীদের সুরক্ষা ও কর্মসংকোচনের সংকটের সমাধান এবং মৎস্য সংরক্ষণ শিল্পের দাবিও কমরেড জানা তুলে ধরছেন।

ক্ষতিপূরণের দাবিতে আলুচাষি সংগ্রাম কমিটির বিক্ষোভ

দফায় দফায় প্রবল বর্ষণের ফলে সারা রাজ্যের মতো পশ্চিম মেদিনীপুরের আলুচাষিরাও ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়েছেন। এই ক্ষতিপূরণের দাবিতে জেলাশাসক সহ বিভিন্ন স্তরে বারবার দাবি জানানো সত্ত্বেও কোনও সুরাহা হয়নি। সারা বাংলা আলুচাষি সংগ্রাম কমিটির পক্ষ থেকে ৪ এপ্রিল পুনরায় জেলাশাসক ও জেলা কৃষি আধিকারিকের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। এই উপলক্ষে ক্ষতিগ্রস্ত চাষিরা জেলাশাসক দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখায়। দাবি করা হয়— যুদ্ধকালীন তৎপরতায় আলুচাষিদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে হবে, ঋণ মকুব করে পুনরায় ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রতি কুইন্ট্যাল ৮০০ টাকা দরে সরকারকে আলু কিনতে হবে। উল্লেখ্য, এই দাবি নিয়ে চন্দ্রকোনা-১, মেদিনীপুর সদর, শালবনী সহ নানা ব্লকে কমিটির নেতৃত্বে আন্দোলন গড়ে উঠেছে।

এদিনের ডেপুটেশন কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন প্রভঞ্জন জানা, প্রদীপ মল্লিক, তাপস মিশ্র, স্বপন মাঝি, শ্রীকান্ত সরেন, অনিল কিস্কু, ললিত মাইতি প্রমুখ।

বাঁকুড়ায় বিদ্যুৎ গ্রাহক আন্দোলনের জয়

বিদ্যুৎ বিলের টাকা জমা সত্ত্বেও অন্যায়ভাবে লাইন কেটে দেওয়া, বাণিজ্যিক সংযোগের জন্য কোটেশনের টাকা জমা দেওয়া সত্ত্বেও নতুন সংযোগ না দেওয়ার প্রতিবাদে এবং কৃষিতে বিতর্কিত সমস্যা সমাধানের দাবিতে রিজিওনাল ম্যানেজারকে ১ এপ্রিল ডেপুটেশন দেওয়া হয় অ্যাবেকার পক্ষ থেকে। আর এম তার বিভাগের ত্রুটি স্বীকার করে চটজলদি বিদ্যুতের সংযোগ দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেন বিভিন্ন স্তরে। বিতর্কিত কৃষি বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধানের সিদ্ধান্ত দ্রুত কার্যকর করবেন বলে জানান।

ডেপুটেশন শেষে এক বিক্ষোভ সভায় নেতৃবৃন্দ নির্বাচনের আগেই গ্রাহকদের মূল দাবি বিদ্যুৎ মাশুল কমানো, কৃষিতে বিনা পয়সায় বিদ্যুৎ দেওয়ার দাবিতে গ্রাহকদের সোচ্চার হতে আহ্বান জানান।

মাথা না নোয়ালে বাঁচতে দেব না ভেনেজুয়েলাকে মার্কিন হুঙ্কার

ভেনেজুয়েলায় গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট মাদুরোর বদলে জুয়ান গুয়াইডো নিজেকে সে দেশের প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত সেখানকার বেশিরভাগ মানুষ তাঁর নামটুকুও জানত না। চরম দক্ষিণপন্থী একটি গ্রুপের সদস্য ৩৫ বছর বয়সী এই মানুষটি কয়েক মাস আগে পর্যন্ত নিজের দলের এক মাঝারি মাপের নেতা ছাড়া আর কিছু ছিলেন না। কিন্তু আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইক পম্পেও-র একটি ফোনের পরেই ২২ জানুয়ারি গুয়াইডো নিজেই নিজেকে একেবারে ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট হিসাবে ঘোষণা করে বসেন। গত দু'দশক ধরে যে দেশটি মার্কিন একাধিপত্যের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তথাকথিত গণতন্ত্র ফেরানোর নামে তাকে মাথা নোয়াতে বাধ্য করতে মার্কিন কর্তারা তাদের 'শাসক বদল কারখানায়' ট্রেনিং দিয়ে গড়েপিটে তুলেছে এই জুয়ান গুয়াইডোকে।

১৯৯৮ সালে হুগো স্যাভেজ ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর থেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিপুল তেল সম্পদে সমৃদ্ধ এই দেশটির দিকে থাবা বাড়ায়। উদ্দেশ্য, সেখানকার বামপন্থী সরকারকে উৎখাত করে নিজেদের অনুগত সরকার বসানো। মার্কিন মদতে বহু বার প্রেসিডেন্ট স্যাভেজকে হত্যার চেষ্টা হয়েছে। বর্তমান প্রেসিডেন্ট মাদুরোর উপরেও ইতিমধ্যেই তিনবার আক্রমণ চালানো হয়েছে।

২০০৫-এর অক্টোবর মাসে, প্রেসিডেন্ট স্যাভেজের জনপ্রিয়তা যখন তুঙ্গে, সেই সময় ভেনেজুয়েলার দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠীর পাঁচ ছাত্রনেতাকে মার্কিন মদতপুষ্ট সেন্টার ফর অ্যাপ্লায়েড নন-ভায়োলেন্ট অ্যাকশন অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিস বা সিএএনভিএএস (ক্যানভ্যাস) নামক একটি সংস্থা সার্বিয়ার বেলগ্রেডে নিয়ে যায়। উদ্দেশ্য— ভেনেজুয়েলায় বিশৃঙ্খলা তৈরির ট্রেনিং দেওয়া। এই ক্যানভ্যাসকে পয়সা জোগায় 'ন্যাশনাল এনডাওমেন্ট ফর ডেমোক্রেসি', যার পিছনে রয়েছে মার্কিন গোয়েন্দা বিভাগ সিআইএ। দেশে দেশে শাসক বদলের মার্কিনী ষড়যন্ত্রের প্রধান যন্ত্রী তারাই। ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইন্সটিটিউট এবং ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ইন্সটিটিউট-এর মতো আরও কয়েকটি সংস্থাও ক্যানভ্যাসকে অর্থ সাহায্য করে। 'শ্যাডো সিআইএ' নামে পরিচিত গোয়েন্দা সংস্থা 'স্ট্র্যাটফোর' থেকে ফাঁস হওয়া ই-মেল থেকে জানা গেছে, ১৯৯৯-২০০০ সালে যুগোস্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট স্লোবোদান মিলোসেভিচের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ফেনিয়ে তোলার জন্যও সিআইএ ক্যানভ্যাসকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছিল। ক্যানভ্যাসের ট্রেনিং কর্মসূচি দেখভাল করার দায়িত্ব পালন করে স্ট্র্যাটফোর। ফাঁস হওয়া ই-মেল সূত্রে স্পষ্ট হয়েছে, কীভাবে তারা ষড়যন্ত্র রূপায়িত করার প্রশিক্ষণ দেয়। তারা ই-মেলে লিখেছে, ভেনেজুয়েলার পাঁচটা বিশ্ববিদ্যালয়ে একই সাথে ছাত্রবিক্ষোভ শুরু হবে, তখন বোঝা যাবে ট্রেনিং শেষ হয়ে 'আসল কাজ' শুরু হয়েছে।

এর দু'বছর পর ২০০৭ সালে শুরু হয় এই 'আসল কাজ'। ওই বছরেই ভেনেজুয়েলার সরকার রাষ্ট্রবিরোধী অভ্যুত্থানে মদত দেওয়ার কারণে মার্কিন পুঁজির মদতপুষ্ট বেসরকারি টেলিভিশন স্টেশন আরসিটিভি-র লাইসেন্স নবীকরণ করতে অস্বীকার করে। একই বছরে প্রেসিডেন্ট স্যাভেজ প্রশাসনিক একটি বিষয়ে গণভোটের আয়োজন করেন। এই দুটি বিষয়কে ঘিরে বিক্ষোভ কর্মসূচি থেকেই মার্কিন মদতে তৈরি হয় 'জেনারেশন ২০০৭' নামের একটি সংগঠন, যার কাজ হল ভেনেজুয়েলায় নানা ভাবে বিশৃঙ্খলা তৈরি করা। ২০০৭ সালে ভেনেজুয়েলায় মার্কিন রাষ্ট্রদূত উইলিয়ান ব্রাউনফিল্ড আমেরিকার স্বরাষ্ট্র দপ্তরে পাঠানো ই-মেলে 'জেনারেশন ২০০৭'-এর প্রভূত প্রশংসা করেন। উইলকিলিকস তা ফাঁস করে দেয়। এদের মদত দেয় ভেনেজুয়েলার স্যাভেজবিরোধী কয়েকজন ধনকুবের এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মদতপুষ্ট কয়েকটি সংস্থা। 'জেনারেশন ২০০৭' ব্যাপক সক্রিয় হয়ে ওঠে ২০০৯ সালে। ২০১০ সালে ভেনেজুয়েলায় ভয়ঙ্কর জলাভাব দেখা দিয়েছিল। বন্ধ হয়ে গিয়েছিল জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলি। সংকট আরও বাড়িয়ে তুলেছিল বিশ্বজোড়া অর্থনৈতিক মন্দা এবং খনিজ তেলের কমতে থাকা দর। ফাঁস হওয়া ই-মেল সূত্রে জানা গেছে, ওই বছরের নভেম্বর মাসে গুয়াইডো সহ আরও কয়েকজন ছাত্র মেক্সিকোর মেক্সিকানা হোটেলে পাঁচদিনের এক গোপন প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছিলেন। প্রশিক্ষণ দিয়েছিল 'ওটপোর' নামের মার্কিন মদতপুষ্ট শাসক-বদলে অভিজ্ঞ একটি সংস্থা। গুয়াইডো ও তার সঙ্গীদের শেখানো হয় কীভাবে এই সুযোগে প্রেসিডেন্ট হুগো স্যাভেজকে হঠানোর ষড়যন্ত্র পাকিয়ে তেলা যায়। সেবারেও অর্থসাহায্য এসেছিল বেশ কয়েকটি মার্কিন সংস্থা থেকে। ষড়যন্ত্রীদের দলে ছিল তেলশিল্পের সঙ্গে যুক্ত ভেনেজুয়েলার তিন ধনকুবেরও— প্রেসিডেন্ট স্যাভেজের জনকল্যাণমুখী নীতি যাদের স্বার্থে ঘা দিয়েছিল।

এই পরিকল্পনার পথ ধরে তৈরি হয় ষড়যন্ত্রের আরও কিছু নকশা, যা পরে ভেনেজুয়েলা সরকারের হাতে আসে। সেইসব নথি ভেনেজুয়েলা সরকার ২০১৪ সালের মে মাসে প্রকাশ করে দেয়। জানা যায় প্রেসিডেন্ট মাদুরো-হত্যা ষড়যন্ত্রের বহু খুঁটিনাটি বিষয়। বেরিয়ে আসে ষড়যন্ত্রের নেতার নাম। আরেকটি ফাঁস হওয়া ই-মেলে সেই নেতাকে দাবি করতে শোনা যায় যে, এই ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্রের উপর আশীর্বাদের হাত রয়েছে কলম্বিয়ার মার্কিন রাষ্ট্রদূত কেভিন হোয়াইটেকারের।

২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সেই ষড়যন্ত্রের অঙ্গ হিসাবেই দেশ জুড়ে তাণ্ডব শুরু হয়। পশ্চিমি সংবাদমাধ্যম এই তাণ্ডবকে প্রেসিডেন্ট মাদুরোর 'স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে ন্যায়সঙ্গত আন্দোলন' বলে ব্যাপক প্রচার দিলেও, আসলে এর পিছনে যে গুয়াইডোর 'পপুলার উইল' সংগঠনটিই আছে, তা ইতিমধ্যেই প্রমাণিত হয়ে গেছে। এই তাণ্ডবে মৃত্যু হয় ৪৩ জনের। কিন্তু প্রেসিডেন্ট মাদুরোকে হঠানোর ষড়যন্ত্র সফল হয় না। এর তিন বছর পরে আবার সক্রিয় হয় তারা। মাদুরো-সমর্থকদের হত্যা করে, জনগণের সম্পত্তি নষ্ট করে আবারও তাণ্ডব চালায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সুতোর টানে নাচতে থাকা কাঠপুতুল গুয়াইডোরা। মৃত্যু হয় ১২৬ জনের, যাদের বেশিরভাগই প্রেসিডেন্ট স্যাভেজের নীতির অনুগামী। অনেককে জীবন্ত পুড়িয়ে মারে গুয়াইডোর দলবল।

২০১৪-র এই সংঘর্ষে গুয়াইডো যে প্রত্যক্ষভাবে

ছয়ের পাতায় দেখুন

রাজ্যের ৪২টি আসনেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে এস ইউ সি আই (সি)

১. কোচবিহার	প্রভাত রায়
২. আলিপুরদুয়ার	রবিচন রাভা
৩. জলপাইগুড়ি	হরিভক্ত সরদার
৪. দার্জিলিং	তন্ময় দত্ত
৫. রায়গঞ্জ	সুজনকৃষ্ণ পাল
৬. বালুরঘাট	বীরেন মহন্ত
৭. মালদা উত্তর	সুভাষ সরকার
৮. মালদা দক্ষিণ	অংশুধর মণ্ডল
৯. জঙ্গিপুর	সামিরুদ্দিন
১০. বহরমপুর	আনিসুল আম্বিয়া
১১. মুর্শিদাবাদ	বকুল খন্দকার
১২. কৃষ্ণনগর	সেখ খোদাবক্স
১৩. রানাঘাট	পরেশচন্দ্র হালদার
১৪. বনগাঁ	স্বপন মণ্ডল
১৫. ব্যারাকপুর	প্রদীপ চৌধুরী
১৬. দমদম	তরুণ দাস
১৭. বারাসাত	তুষার ঘোষ
১৮. বসিরহাট	অজয় বাইন
১৯. জয়নগর	জয়কৃষ্ণ হালদার
২০. মথুরাপুর	পূর্ণচন্দ্র নাইয়া
২১. ডায়মন্ডহারবার	অজয় ঘোষ
২২. যাদবপুর	সুজাতা ব্যানার্জী
২৩. কলকাতা দক্ষিণ	দেবব্রত বেরা
২৪. কলকাতা উত্তর	বিজ্ঞান বেরা
২৫. হাওড়া	শানওয়াজ
২৬. উলুবেড়িয়া	মিনতি সরকার
২৭. শ্রীরামপুর	প্রদ্যোৎ চৌধুরী
২৮. হুগলি	ভাস্কর ঘোষ
২৯. আরামবাগ	প্রশান্ত মালিক
৩০. তমলুক	মধুসূদন বেরা
৩১. কাঁথি	মানস প্রধান
৩২. ঘাটাল	দীনেশ মেইকাপ
৩৩. ঝাড়গ্রাম	সুশীল মাণ্ডি
৩৪. মেদিনীপুর	তুষার জানা
৩৫. পুরুলিয়া	রঙ্গলাল কুমার
৩৬. বাঁকুড়া	তন্ময় মণ্ডল
৩৭. বিষ্ণুপুর	অজিত বাউরি
৩৮. বর্ধমান পূর্ব	নির্মল মাঝি
৩৯. বর্ধমান-দুর্গাপুর	সুচেতা কুণ্ডু
৪০. আসানসোল	অমর চৌধুরী
৪১. বোলপুর	বিজয় দলুই
৪২. বীরভূম	আয়েষা খাতুন

হরিয়ানার ৪টি কেন্দ্রে লড়ছে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)

৫ এপ্রিল এক সাংবাদিক সম্মেলনে দলের পলিটবুরো সদস্য ও হরিয়ানা রাজ্য সম্পাদক কমরেড সত্যবান হরিয়ানার চারটি লোকসভা কেন্দ্রের এস ইউ সি আই (সি) প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন।

তিনি বলেন, "দেশের ২৩টি রাজ্যে ১১৯টি আসনে দলের প্রার্থীরা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। গণআন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্য নিয়েই। হরিয়ানার রোহতক কেন্দ্রে জয়করণ মান্ডোটি, সোনিপত কেন্দ্রে বলবীর সিং, গুরগাঁও কেন্দ্রে শ্রবণ কুমার এবং ভিওয়ানি-মহেন্দ্রগড় কেন্দ্রে ওমপ্রকাশ প্রার্থী হচ্ছেন।"

দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে চলছে দেওয়াল লিখন ও প্রচার

অন্যান্য রাজ্যের প্রার্থী সংখ্যা

ওড়িশা	৮
আসাম	৬
বিহার	৮
উত্তরপ্রদেশ	৪
ছত্তিশগড়	৩
দিল্লি	২
গুজরাট	২
হরিয়ানা	৪
ঝাড়খণ্ড	৫
কর্ণাটক	৮
কেরালা	৯
তামিলনাড়ু	৪
অন্ধ্রপ্রদেশ	২
তেলেঙ্গানা	২
মধ্যপ্রদেশ	৩
মহারাষ্ট্র	১
পাঞ্জাব	১
রাজস্থান	১
ত্রিপুরা	১
উত্তরাখণ্ড	১
পুদুচেরি	১
বিধানসভায় প্রার্থী	
ওড়িশা	২৪
অন্ধ্রপ্রদেশ	৩

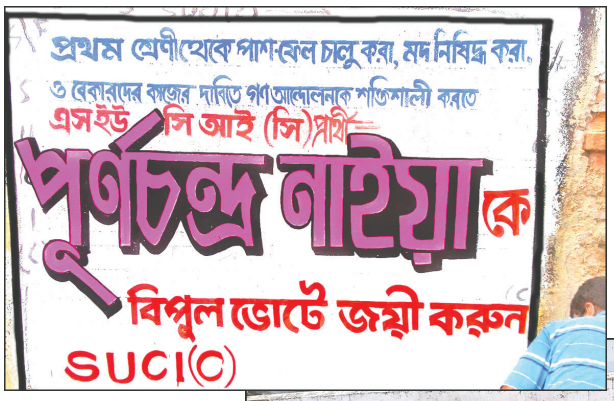

মথুরাপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা
কমরেড পূর্ণচন্দ্র নাইয়া

জলপাইগুড়ি, উত্তরবঙ্গ
কমরেড হরিভক্ত সর্দার

বিহারের ভাগলপুর কেন্দ্রের প্রার্থী কমরেড দীপক কুমার মনোনয়ন পত্র জমা করতে চলেছেন

মালদা দক্ষিণ
কমরেড অংশুধর মণ্ডল

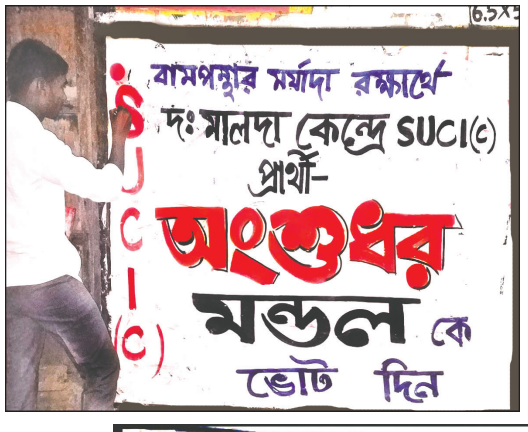

কর্ণাটকের ধরওয়ারের প্রার্থী কমরেড গঙ্গাধর বাদীগর প্রচার করছেন

পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথি কেন্দ্রে দেওয়াল লিখন

পাঠকের মতামত

শিক্ষক আন্দোলনে পুলিশি আক্রমণ

রাজ্যে একের পর এক শিক্ষক আন্দোলনে ব্যাপক পুলিশি আক্রমণ ও লাঠিচার্জের ঘটনা ঘটছে। সম্প্রতি কম্পিউটার শিক্ষকদের আন্দোলনে ব্যাপকভাবে পুলিশি লাঠিচার্জের ঘটনা ঘটে গেল। তার কয়েকদিন আগে মাদ্রাসা শিক্ষকদের আন্দোলনেও দমনপীড়ন চলল। তার আগে উচ্চ প্রাথমিকে দুর্নীতি বন্ধ করে সুস্থভাবে শিক্ষক নিয়োগের দাবিতে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের সামনে অনশনরতদের জবরদস্তি পুলিশ তুলে দিল, ধরপাকড়ও হল। সমস্ত শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে একের পর এক এই ধরনের ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে সরকার কত জনবিরোধী চরিত্র নিয়ে চলছে।

এস এস সি-র দুর্নীতির বিরুদ্ধে সুষ্ঠুভাবে শিক্ষক নিয়োগের দাবিতে প্রেস ক্লাবের সামনে দীর্ঘদিন ধরে চলা অনশন আন্দোলনের কথা তো সকলেরই জানা। ২৯ দিন অনশনের পর মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া শুকনো প্রতিশ্রুতি নিয়েই তাঁদের আন্দোলন তুলে নিতে হল। যদিও এঁদের সমস্যার কতটা সুরাহা হবে কে জানে? কারণ ইতিমধ্যেই শূন্যপদের সংখ্যা কোন ম্যাজিক বলে প্রায় চল্লিশ শতাংশ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ন্যায়সঙ্গত শান্তিপূর্ণ আন্দোলনগুলিকে সরকারের পক্ষ থেকে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা তো দূরের কথা— জবরদস্তি শুধু নয়, ব্যাপকভাবে দমন-পীড়ন চালানো হচ্ছে, ব্যাপক পুলিশি হামলা হচ্ছে এবং তার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে দুঃখপ্রকাশ বা সহানুভূতি একেবারেই দেখা যাচ্ছে না। অন্য দিকে যেভাবে তাঁদের ন্যায্য দাবি থেকে দীর্ঘকাল বঞ্চিত রাখা হয়েছে—তারও সমাধানের কোনও ইঙ্গিত নেই। অসহায়তার শিকার এই সব বঞ্চিত মানুষগুলি।

আমরা মনে করি, অবিলম্বে সমস্ত শিক্ষা আন্দোলনে পুলিশি দমন-পীড়ন বন্ধ হোক এবং ভবিষ্যতে যাতে এর পুনরাবৃত্তি না ঘটে তা সরকারকে সুনিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি এদের সমস্যাগুলির সুষ্ঠু সমাধান করতে হবে এবং তা করতে হবে অতি দ্রুত।

কার্তিক সাহা
সাধারণ সম্পাদক
অল বেঙ্গল সেভ এডুকেশন কমিটি

সিপিএমের সুবিধাবাদী রাজনীতি

একের পাতার পর

তৃণমূল-বিজেপিকে হারানোর ফরমুলা নিজেরাই কি ভাঙলেন না? আসলে মুখে তাঁরা যতই বলুন, তৃণমূল, বিজেপিকে হারানোই লক্ষ্য— মানুষ দেখছে আসলে লক্ষ্যটি হল যে ভাবেই হোক একটা-দুটো আসন জেতা।

নির্বাচনে জেতা অবশ্যই সংগ্রামের একটি লক্ষ্য। কিন্তু যে কোনও ভাবেই হোক জেতা বামপন্থীদের লক্ষ্য হতে পারে কি? জেতার লক্ষ্যে মূল উদ্দেশ্যটাকেই শিকেয় তুলে রাখতে পারে নাকি কোনও বামপন্থী দল? কংগ্রেস ভারতের পুঁজিপতি শ্রেণির সবচেয়ে পুরনো সেবাদাস এবং তাদের অত্যন্ত বিশ্বস্ত দল। কংগ্রেসের দীর্ঘ অপশাসনের কথা দেশের মানুষ জানে। তাদের শাসনের ফলে গরিবি বেড়েছে। অসংখ্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার হোতা কংগ্রেস। জরুরি অবস্থা জারি করে কংগ্রেস গণতন্ত্রকে হত্যা করেছে। যে কোনও গণআন্দোলন দেখলেই কংগ্রেস সরকার তার উপর নির্মম অত্যাচার করেছে। গুলি চালিয়ে অসংখ্য শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-যুবককে হত্যা করেছে। এ হেন কংগ্রেসকে ধর্মনিরপেক্ষ এবং গণতান্ত্রিক শক্তি হিসেবে আখ্যা বামপন্থীরা কখনওই দিতে পারে না। সিপিএম এর দ্বারা শ্রমিক-চাষিদের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়াল। যে কংগ্রেসের জনবিরোধী নীতির ফলে জনজীবন জেরবার, সেই কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আন্দোলনের পরিবর্তে তার সঙ্গে মৈত্রী ফরমূলা এনে শোষিত মানুষের শ্রেণি দৃষ্টিভঙ্গিটাকেই গুলিয়ে ফেলা হল। এর দ্বারা বামপন্থায় বিশ্বাসী শ্রমিক-কৃষক-সাধারণ মানুষকে আন্দোলনের প্রশ্নেও বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির সামনে ঠেলে দেওয়া হল। বুর্জোয়া রাজনীতিবিদরা মানুষকে বোঝান যে, একটি বুর্জোয়া শ্রেণির স্বার্থরক্ষাকারী দলের উপর মানুষ খেপে গেলে ভোটে তাকে বদলে দিয়ে আর একটি দলকে ক্ষমতায় বসালেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। সিপিএমের তৃণমূল-বিজেপিকে হারাতে কংগ্রেস প্রীতি ঠিক একই কায়দায় মানুষকে আন্দোলনের বদলে নিকৃষ্ট বুর্জোয়া ভোট সর্বস্ব রাজনীতির দিকে আরও ঠেলে দিল।

যে কোনও ভাবেই হোক না কেন, আমরা ভোটে জিতলেই সব ঠিক হয়ে যাবে— মানুষকে এ কথা বোঝানো কোনও নীতি নয়, সুবিধাবাদ। এই সুবিধাবাদই কেরালায় আরএসপিকে সিপিএম জোট থেকে সরিয়ে কংগ্রেসের জোটে সামিল করেছে। দল অনুসৃত এই সুবিধাবাদই দলের নেতা-কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক প্রভাব ফেলছে। তারাও অঙ্ক কষছে কোন দলে গেলে এবং ভোটে দাঁড়ালে জয়ের সম্ভাবনা বেশি, সুযোগ বুঝে তারা দলত্যাগ করছে। সিপিএম, আরএসপি, ফরওয়ার্ড ব্লকের যে সব বিধায়ক-সাংসদ সম্প্রতি এবং বিগত বছরগুলিতে তৃণমূল এবং বিজেপিতে নাম লিখিয়েছেন এবং ভোটে দাঁড়িয়েছেন, নিচের তলার নেতা-কর্মী-সমর্থকরাও যে দলে দলে তৃণমূলে গিয়ে ভিড়ছে, বিজেপিতে ভিড়ছে, তার পিছনে রয়েছে নেতৃত্বের এই নিকৃষ্ট সুবিধাবাদী রাজনীতির চর্চা।

তৃণমূল-বিজেপি বিরোধিতাকে সিপিএম যেভাবে পাখির চোখ হিসাবে দেখছে সেটাও কি আন্তরিক, নাকি একটা 'রাজনৈতিক লজ্জ'? এখন মানুষ তুলনা করে দুর্নীতি, দলবাজি, স্বজন-পোষণ, তোলাবাজি, রাজনৈতিক বিরোধীদের উপর সন্ত্রাস, জনবিরোধী নীতি নিয়ে সরকার চালানো, বিদ্যুতের দাম বাড়ানো, মদের প্রসার বাড়ানো, এই সব কাজে কে বেশি এগিয়ে, সিপিএম নাকি তৃণমূল? যেসব অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে উঠছে, সবই চরম আকার নিয়েছিল সিপিএমের শাসনে। জনবিরোধী নীতি যা তৃণমূল শাসনে চলছে, তার বেশির ভাগই সিপিএমের আমলেই গৃহীত। ফলে সিপিএম যখন তৃণমূল অপসারণের দাবি তোলে তা মানুষের মধ্যে দাগ কাটে না। তাদের তৃণমূল বিরোধিতার মধ্যেও নীতিগত কোনও বিষয় নেই, রয়েছে স্রেফ গদি হারানোর জ্বালা।

তাদের বিজেপি বিরোধিতাতেও কোনও আন্তরিকতা নেই। ভোটের যে লক্ষ্য এখন তাদের কংগ্রেসমুখী করে তুলেছে, সেই লক্ষ্যই একসময় তাদের বিজেপি ঘনিষ্ঠও করেছিল। আশির দশকে কলকাতা কর্পোরেশন নির্বাচনে বোর্ড গঠনের উদ্দেশ্যে বিজেপি কাউন্সিলারের সমর্থন নেওয়া, শহিদ মিনার ময়দানে অটল বিহারী বাজপেয়ীকে আমন্ত্রণ করে এনে জনসভা করা, জ্যোতি বসুর সঙ্গে বাজপেয়ীজির হাত ধরা ঐক্যের ছবি এ রাজ্যের মানুষ দেখেছে। সেই কারণে সাধারণ মানুষ তো বটেই, তাঁদের দলের কর্মী-সমর্থকরা পর্যন্ত তাদের বিজেপি বিরোধিতার মধ্যে নীতিগত অবস্থান দেখতে পান না। তাঁরা বুঝে গিয়েছেন 'নীতি-ফিতি পরে, ভোটই আসল'— বামপন্থা মানে যে শুধু কিছু স্লোগান আর ভোটের একটা কৌশল মাত্র নয়, সিপিএম নেতৃত্ব কর্মী-সমর্থকদের সেটাও ভুলিয়ে দিচ্ছেন।

বামপন্থী এবং গণতান্ত্রিক মানুষদের মনে রাখা দরকার, বিজেপিকে শুধু ভোটে পরাজিত করলেই সাম্প্রদায়িকতার পরাজয় ঘটে যায় না। ইতিপূর্বে কেন্দ্রে বিজেপি একবার পরাস্ত হয়েছে। কিছু কিছু রাজ্যেও বিজেপি পরাজিত হয়েছে। কিন্তু তারা দ্বারা সাম্প্রদায়িকতা পরাস্ত হয়নি। বর্তমানে সাম্প্রদায়িকতা শোষক পুঁজিপতি শ্রেণির হাতে জনগণের ঐক্য ধ্বংস করার শক্তিশালী হাতিয়ার। পুঁজিপতিরা গণআন্দোলন ধ্বংস করতে এই সাম্প্রদায়িকতাকে ইন্ধন দিয়ে থাকে। ক্ষমতাসীন সরকার কখনও কখনও সাম্প্রদাকিতায় উস্কানি দেয় অপশাসন বা ব্যর্থতা থেকে দৃষ্টি অন্যদিকে সরিয়ে নিতে। আর ভোট-সর্বস্ব রাজনৈতিক দলগুলি সাম্প্রদায়িকতায় ইন্ধন দেয় সাম্প্রদায়িক বিভাজন ঘটিয়ে ভোটে জেতার জন্য।

সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়তে হলে, এই সার্বিক চক্রান্তের বিরুদ্ধে তীব্র আদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনা করতে হবে। একই সাথে জনজীবনের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে তীব্র গণআন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। কোনওটিতেই সিপিএমের কোনও আগ্রহ নেই। যখন প্রয়োজন বামপন্থী আন্দোলনের বিকল্প ধারার জন্ম দেওয়া, তখন সিপিএম দু-চারটে আসন জেতার জন্য ভিড়ে যাচ্ছে কংগ্রেস শিবিরে।

কংগ্রেস কি বামপন্থীদের শক্তিবৃদ্ধির কোনও সুযোগ দিতে পারে? কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করার জন্য সিপিএমের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, এরিয়া কমিটির সম্মেলন থেকে পার্টি কংগ্রেস— এসব থেকে কংগ্রেস বুঝেছে সিপিএমকে যে শর্ত দেওয়া যাবে, ভোটের লোভে তা মানতে তারা বাধ্য হবে। সিপিএম কংগ্রেসের সমঝোতা ভেস্তে যাওয়ার দায় কার কতটা? এ চর্চার সঙ্গে কোনও জনস্বার্থ জড়িত নেই। জনস্বার্থ জড়িত ছিল না এই সমঝোতা প্রয়াসের মধ্যেও।

এই অবস্থায় সংগ্রামী বামপন্থার জাগরণ ঘটানোই বামপন্থীদের সামনে জরুরি কর্তব্য। সিপিএমের সৎ কর্মী-সমর্থকদের বিষয়টি ভেবে দেখতে অনুরোধ করি।

ভেনেজুয়েলা

চারের পাতার পর

যুক্ত ছিলেন, তা প্রমাণিত হয়েছে। তিনি নিজেই একটি ভিডিও টুইট করেন যেখানে তাঁকে হেলমেট ও গ্যাস-মুখোশ পরে থাকা অবস্থায় একটি হাইওয়েতে পুলিশের সাথে সংঘর্ষরত অবস্থায় দেখা যাচ্ছে। সেই অমানবিক তাণ্ডবে মোটরসাইকেল আরোহীদের হত্যা বা আহত করতে এরা রাস্তায় স্টিলের তার ফেলে রাখত। ভেনেজুয়েলার গণতন্ত্র নেই বলে চিৎকার করা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের হাতের পুতুল গুয়াইডোর দলবলের সাধারণ মানুষের প্রাণের প্রতি দরদের এই হল নমুনা।

প্রেসিডেন্ট মাদুরোকে হঠানোর ষড়যন্ত্র সফল করতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ দেশের রাজনীতিতে একেবারেই অপরিচিত এই গুয়াইডোকে বেছে নিল কেন? এ ব্যাপারে আলোকপাত করেছেন ভেনেজুয়েলারই এক বিশ্লেষক। তিনি দেখিয়েছেন, আদর্শের বালাই না থাকায় গুয়াইডোকে যেমন খুশি তেমন রূপেই সাজিয়ে দিতে পারা যায়। সামাম্রাজ্যবাদীরা। তাই তাকেই বেছে নিয়েছে তারা।

প্রেসিডেন্ট হিসাবে মাদুরোর দ্বিতীয়বার শপথ নেওয়ার সময় যাতে ভেনেজুয়েলায় ব্যাপক বিশৃঙ্খলা তৈরি করার ট্রেনিং নিতে ২০১৮-র ডিসেম্বরে গুয়াইডো ওয়াশিংটনে যান। মাদুরোর শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের ঠিক আগের রাতে মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্স এবং কানাডার বিদেশ মন্ত্রী গুয়াইডোকে ফোন করে তাঁর প্রতি নিজেদের সমর্থনের কথা জানিয়ে দেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পও জানিয়ে দেন, গুয়াইডো নিজেকে প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করলে তিনি সমর্থন করবেন। মার্কিন সেক্রেটারি অফ স্টেট মাইক পম্পেও গুয়াইডোর সাথে দেখা করেন।

আসলে ভেনেজুয়েলার রাজনৈতিক মহলে গুয়াইডো যতই অপরিচিত হোক, ঠিক এইরকম একজন নীতি- আদর্শহীন মানুষের প্রয়োজন ছিল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের, যার চরিত্রে জঙ্গিভাব এবং সুবিধাবাদের মিশেল রয়েছে। যে কারণে ট্রাম্প প্রশাসনের এক সদস্য গুয়াইডো সম্পর্কে বলেছেন, 'ভেনেজুয়েলায় আমাদের মতলব হাসিল করার জন্য ঠিক এরকম একজন লোকেরই দরকার ছিল'। খনিজ তেলের লক্ষ্যে ভেনেজুয়েলায় হানাদারি চালানোর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সুরে সুর মিলিয়ে, গুয়াইডোও দেশের সংকট কাটানোর অজুহাতে '(আমেরিকার) মানবিক হস্তক্ষেপে'র আহ্বান জানিয়েছেন। এভাবেই পোষা তোতাপাখির মতো মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের শেখানো বুলি আউড়ে ভেনেজুয়েলায় মার্কিন আগ্রাসনের রাস্তা পরিষ্কার করার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন গুয়াইডোরা এবং এই লক্ষ্যেই তাদের সামনে আনছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ।

ভেনেজুয়েলায় ইয়াঙ্কিরা কেন? মারাদোনা

কেন ইয়াঙ্কিরা (মার্কিন) ভেনেজুয়েলায় নাক গলাচ্ছে? মেক্সিকোর ডোরাডোস ক্লাবের টেকনিক্যাল ডিরেক্টর হিসাবে তাঁর দলের জয়কে ভেনেজুয়েলার নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট মাদুরোর উদ্দেশ্যে নিবেদন করে এই মন্তব্যই করলেন বিশ্বখ্যাত ফুটবলার দিয়েগো মারাদোনা।

১ এপ্রিল ম্যাচ জেতার পর সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, পৃথিবীর দণ্ডমুণ্ডের কর্তা সাজা ওই ইয়াঙ্কিরা কারা? ওদের হাতে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় বোমা আছে বলেই কি ওরা আমাদের চেয়ে বড় হয়ে গেছে? কখনওই তা হবে না। মার্কিন নির্দেশে চলা গুয়াইডো নামক ওই পুতুলটাকে ওরা ভেনেজুয়েলার ঘাড়ে চাপাতে পারবে না।

প্রসঙ্গত, এই মন্তব্যের জেরে মার্কিন সরকারের নির্দেশে মেক্সিকো সরকার মারাদোনার মতো খেলোয়াড়কে তাঁর পদ থেকে সরানোর জন্য ফুটবল ফেডারেশনের উপর চাপ দিচ্ছে।

‘বইটা আমার সব পেশেন্টদের বাড়ির লোকেদের দিন’

‘জনস্বার্থে নির্বাচনকে কোন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে হবে’।

যখন নির্বাচনী প্রচারে কথার ফুলঝুরি ছুটছে রঙ-বেরঙের দলের নেতাদের মুখে, তার মধ্যে খুব সাদামাটা একটি বাক্য। কী দাম আছে এর! কোনও খবরের কাগজের হেডিং খুঁজলে পাওয়া যাবে না, টিভি চ্যানেলের নামী-দামি অ্যাঙ্করদের সান্ধ্য তর্ক-আসরেও তার ঠাঁই নেই। বড় বড় ঝকমকে নেতাদের সভা কাঁপানো লাউড স্পিকারের ঝড়েও তার ঠাঁই হওয়ার নয়। তবু এই একটি শব্দ-বন্ধই আলোড়ন তুলছে, স্পন্দন জাগাচ্ছে মানুষের বিবেকে। যে মনুষ্যত্বকে শত চেষ্টাতেও শাসকশ্রেণি নির্মূল করে দিতে পারেনি, তারই দরবারে আবেদন নিয়ে পৌঁছে যাচ্ছে এই কথাগুলি।

এস ইউ সি আই (সি)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের আবেদন সংবলিত পুস্তিকার এই শিরোনামটাই হয়ে উঠছে বহু জায়গার আলোচ্য বিষয়। হাজার হাজার কর্মীর চেষ্টায় সে বই পৌঁছে যাচ্ছে মানুষের হাতে হাতে। ট্রেন ধরার তাড়ায় ঊর্ধ্বশ্বাসে ছোটা অফিসযাত্রীও তাই একটু থামছেন, নিয়ে যাচ্ছেন বই। আবার বাড়িতে বাড়িতে যাঁরা সংসারের সকলের মঙ্গলের সাধনায় দিন-রাত এক করে ফেলেন, সেই মা-কাকিমারা, যাঁরা নিতান্তই গৃহবধূ, হাতে তুলে নিচ্ছেন এই বই। তন্ন-তন্ন করে খুঁজছেন নির্বাচনী ডামাডোলের মাঝে গুলিয়ে যাওয়া সত্যের পথ। খাস কলকাতার ডালহৌসি পাড়া থেকে একেবারে প্রত্যন্ত গ্রামের খেতে খামারে, কারখানার গেটে, হাটে-গঞ্জে এমন করেই হাতে হাতে পৌঁছে যাচ্ছে সে বই। কখনও লোকাল ট্রেনের কামরায় কখনও বা ভরা বাজারের চাপ-চাপ ভিড়ের ফাঁকে ফাঁকেও একটু কান পাতলেই প্রায়ই শোনা যাচ্ছে এই গুঞ্জন। যেমন দেখা গেল এপ্রিলের প্রথম শনিবারেই মধ্য কলকাতার লেবুতলা এলাকার ন্যাড়া গির্জার বাজারে। এস ইউ সি আই (সি) কর্মীরা বই বিক্রি করছিলেন। চায়ের দোকানে তখন আলোচ্য— ‘রাজ্যে ৪২টা আসনেই এস ইউ সি লড়ছে’? এক ছাত্রকর্মীকে ডাকলেন বর্ষীয়ান একজন। ‘বাড়িতে এস, তোমরা ৪২টা আসনেই লড়ছ! বিরাট খরচ, এত পাবে কোথায়? কিছু টাকা নিয়ে যেও।’ দিয়েছেন তিনি যথাসাধ্য। এমন অভিজ্ঞতা একটি নয়, সারা রাজ্য জুড়ে এমনই অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হচ্ছেন অক্লান্ত প্রচারে ব্যস্ত দলের কর্মী-সমর্থকরা।

নির্বাচন একটি রাজনৈতিক সংগ্রাম। তাতে গুরুত্বপূর্ণ বিচার্য কী? রকমারি দলের ওজনদার, নানা তকমাধারী চটকদারি কথা? নাকি জনজীবনের সমস্যা সম্পর্কে সে দলের দৃষ্টিভঙ্গিটা ঠিক কী? এটা বুঝতে চাওয়াটাই যে সবচেয়ে জরুরি প্রয়োজন। এই কথাটাই ভোটবাজ দলগুলি ভুলিয়ে দিতে চায় মানুষকে। আর নির্বাচনের মুখে ঠিক সেই প্রশ্নটাই তুলে ধরছে এস ইউ সি আই (সি)। স্বাধীনতার ৭২ বছরে ১৬ বার পার্লামেন্টে প্রতিনিধি পাঠাতে ভোট দিয়েছে মানুষ। পরিণামে কী পেয়েছে তারা? সরকার এসেছে, সরকার গেছে, গদিতে আসীন দলের নাম ঝান্ডার রঙের পরিবর্তন হয়েছে। মানুষের জীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলির কী সমাধান হয়েছে? কেন হল না? কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে সেই প্রশ্নটাই তুলেছে কমরেড প্রভাস ঘোষের বই। তাই মানুষের বিবেককে তা নাড়া দিয়েছে। সে কারণেই দলের ৪৮ লেনিন সরণির দপ্তরের ফোন নম্বর জোগাড় করে কলকাতার হরিদেবপুর থেকে ফোন করেছেন এক মহিলা। বইটি পড়েছেন তিনি। জীবন সম্পর্কে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি পেয়ে অভিভূত। দলের সাথে নিবিড় যোগাযোগ চান। বাঁকুড়া শহরের এক ব্যস্ত ডাক্তারবাবু বইটা নিজে পড়ার পর ডেকে পাঠিয়েছেন, দলের সংগঠককে। তিনি পৌঁছতেই তাঁর প্রথম প্রশ্ন, ‘সাথে বইটা বেশি করে এনেছেন? আমার সব পেশেন্টদের বাড়ির লোককে দিন। আমি চাই সকলে পড়ুক।’

পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়া থেকে কলকাতার গার্ডেনরিচে কাজের সূত্রে আসা একজন দীর্ঘদিন সিপিএম করেছেন। খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন বামপন্থার যথার্থ স্বর। বইটি হঠাৎ করে পেয়েছেন এক রাস্তার মোড়ে। নিঃশেষে পড়েছেন সবটা। পরদিন গার্ডেনরিচের এক প্রচার টেবিলের কাছে এসে বলে গেছেন, আপনারাই আজ একমাত্র বামপন্থী। আপনাদের পাশেই আজ থাকা দরকার। আপনাদের কর্মীরা যেন আমার বাড়িতে যোগাযোগ করে।

পিজি হাসপাতালের গেটে দাঁড়িয়ে বই বিক্রি করতে গিয়ে এক ছাত্রী কর্মীর অভিজ্ঞতা মন ছুঁয়ে যায়। এক মধ্যবয়স্ক মানুষ এসেছিলেন স্ত্রীর গুরুতর রোগের চিকিৎসা করাতে। বই নেওয়ার জন্য তাঁকে অনুরোধ করতে দাঁড়ালেন। নিজের পরিচয় দিলেন পশ্চিম মেদিনীপুরের এক সিপিএম সমর্থক হিসাবে। বইটা হাতে নিয়ে একটু যেন থমকে দাঁড়িয়ে ভাবলেন কিছু, তারপর বললেন, আমি অন্য দল করি কিন্তু মনে করি বামপন্থী রাজনীতিতে এসইউসিআই(সি) একটা বিশিষ্ট মর্যাদার দাবি রাখে। বামপন্থার ঝান্ডাটা আপনারাই শেষ পর্যন্ত তুলে ধরে আছেন। বইয়ের সাথে গণদাবীর ৭১ বর্ষ, ৩১ সংখ্যাটিও নিলেন। ওই সংখ্যায় সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের সাংবাদিক সম্মেলনের বক্তব্যের সাথে ছাপা হয়েছিল তাঁর একটি ছবি। স্ত্রী কাগজটা ভাঁজ করে ব্যাগে ঢোকাতে যেতে বাধা দিয়ে বললেন, দাঁড়াও ভাল করে একটু মুখটা দেখি। বহুক্ষণ তাকিয়ে আছেন ছবির দিকে, অস্ফুটে বলছেন শোনা গেল— ভরসা লাগে। সিপিএম হয়ত তোমাদের থেকে ভোট বেশি পাবে, দু-চারটে সিটও পেতে পারে, কিন্তু এখন বামপন্থার ভরসা তোমরাই।

সেই সুন্দরবনের কোলে পাথরপ্রতিমার গ্রাম থেকে কলকাতায় রঙের কাজ করতে এসে সরশুনাতে ঘর ভাড়া নিয়ে থাকা এক শ্রমিকের মুখেও সেই একই কথা। গড়িয়াহাটে সিগন্যালে থামা মিনিবাসের ড্রাইভার-কন্ডাক্টর-যাত্রী, রবিবারের হরিসাহা হাটের হকার, খান্না মোড়ের বাসড্রাইভার নিজের থেকে ডেকে চেয়ে নিয়েছেন বই। এমন দৃশ্য দেখা যাচ্ছে বহু জায়গায়।

কলেজ স্ট্রিটের প্রকাশক থেকে শুরু করে ঠনঠনিয়ার বাসিন্দা চাকুরিজীবী প্রত্যেকের মুখ থেকেই শোনা কথাগুলির নির্যাস এক— এই রাজনীতিটাকে বড় করে তোলাটাই আজ সবচেয়ে জরুরি কাজ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং তার আশেপাশে দলের কাজে নিযুক্ত এক এসইউসিআই(সি) কর্মীকে এক প্রকাশনা সংস্থার কর্ণধার বলে দিয়েছেন, ‘তোমরা জিতবে কি জিতবে না, সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা হল তোমাদের এই রাজনীতির শক্তিটাকে বাড়ানো। এটাই আজ আমাদের সকলের কর্তব্য।’

বাঁকুড়ার সোনামুখির এক অঙ্কের অধ্যাপক বলেছেন তাঁর নিজস্ব অঙ্কের ভাষায়। বই কিনে নিয়ে গিয়েছিলেন সকালে, পড়ে শেষ করার পর রাত ১১টায় ফোন করেছেন দলের এক সংগঠককে। বললেন, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েছি— “আমি অঙ্ক শেখাতে ক্লাসে ছাত্রদের বলি ‘নানা মুনির নানা মত, অঙ্কের কিন্তু সোজা পথ’ অর্থাৎ অঙ্ক কারও মুখ দেখে চলে না। সোজা সাপ্টা সত্যটাই তুলে ধরে। আপনাদের বইও অন্য সব কথাকে চাপা দিয়ে সত্য কথাটা সোজা ভাবে বলে দিয়েছে। এটাই সঠিক কথা। তিনি আরও বই চেয়ে পাঠিয়েছেন, অন্যদের দেওয়ার জন্য। বাঁকুড়ার রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের কর্মী রাস্তা থেকে বই নিয়ে গিয়ে পড়েছিলেন। পরদিন ডেকে পাঠিয়েছেন দলের এক পরিচিত সংগঠককে। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তাঁর ব্যাঙ্কের সমস্ত সহকর্মীদের বই দিয়েছেন।

কলকাতার টালিগঞ্জ এলাকার এক প্রাক্তন সিপিএম সমর্থকের কথায়— প্রকৃত বামপন্থী না হলে কেউ এমন কথা লিখতে পারে না। রাজারহাটের বাসিন্দা এক উচ্চপদস্থ ইঞ্জিনিয়ার নিজে বইটি পড়ার পর আরও ১০০ কপি চেয়ে পাঠিয়েছেন। বলেছেন, ‘পরিচিত সকলকে দেব’। তিনি ছাত্রাবস্থা থেকে সিপিআই-সিপিএম রাজনীতির সাথে যুক্ত থেকেছেন। ছাত্রজীবনে শুনেছিলেন, বামপন্থী রাজনীতিকে উচ্চ-আদর্শের তারে বাঁধতে কমরেড শিবদাস ঘোষের সংগ্রামের কথা। একদিন কৌতূহলী হয়ে কমরেড শিবদাস ঘোষ যেখানে থাকতেন সেই টালা কমিউন দেখতে চলেও গিয়েছিলেন। সঠিক বামপন্থী আদর্শের খোঁজ করেছেন সারা জীবন। আশা ছিল ভুল বুঝে সিপিএম আবার বামপন্থার পথে ফিরবে। আজ বুঝছেন তা সম্ভব নয়। তাই প্রকৃত বামপন্থার খোঁজ করতে গিয়ে নতুন করে সন্ধান করছেন এস ইউ সি আই (সি)-র আদর্শকে।

৬ এপ্রিল সরশুনাতে বাইক থামিয়ে অনেকক্ষণ মাইকের প্রচারের কথা শুনছিলেন এক যুবক। কিছুক্ষণ পর গিয়ে দাঁড়ালেন টেবিলে বসা কর্মীদের সামনে। ‘আপনারা যা বলছেন, তা সত্যিই ভিতর থেকে বলছেন? এমন করে ভাবেন আপনারা? এই নির্বাচনী ব্যবস্থায় বামপন্থীরা যেভাবে হোক কিছু সিট বেশি পেলেই বামপন্থী আন্দোলনের কোনও লাভ হবে কি? এ আমারও প্রশ্ন। সিটের লোভে আদর্শ বিসর্জন দিলে মানুষের জন্য কিছুই করা যাবে না। এ কখনও বামপন্থার লক্ষ্য হতে পারে!’ পরিচয় দিয়ে জানালেন, তিনি মধ্য কলকাতার এক ওয়ার্ডের সিপিএমের যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআইয়ের সম্পাদক। সিপিএমকে আর বামপন্থী বলতে মন চাইছে না। বই নিয়েছেন, ফোন নম্বর ঠিকানা দিয়ে যোগাযোগ করতে বলে গেছেন। ওই সরশুনাতেই দাঁড়িয়ে প্রচারের কথাগুলি শুনছিলেন আরেক যুবক। এগিয়ে এসে বললেন, ‘মদ নিষিদ্ধ করার দাবি তুলছে কোনও রাজনৈতিক দল, তা আগে শুনিনি।’ বলেছেন, আপনাদের সাথে থাকব।

একটি অনন্য অভিজ্ঞতার স্বাদ পেলেন বালিগঞ্জ ফাঁড়িতে প্রচার এবং বই বিক্রির কাজে মগ্ন কিছু ছাত্র-ছাত্রী কর্মী। ৫ এপ্রিল সারা দিন ধরে প্রচার করছিলেন তাঁরা। সন্ধ্যার শুরুর দিকেই এসে দাঁড়ালেন এক প্রৌঢ়া। বই নিলেন, কিন্তু প্রশ্ন তোমরা কী পাচ্ছ? অল্পবয়সী ছাত্রীটি মিষ্টি হেসে উত্তর দিয়েছে— আদর্শের স্বাদ, একটা মর্যাদাময় জীবনের স্বপ্ন, এ কি কম পাওয়া কাকিমা! প্রৌঢ়ার কৌতূহল গেল বেড়ে, জনে জনে জিজ্ঞাসা করছেন, কী পাবে তুমি? কত বেশি, কত বড় সেই পাওনা, যার জন্য শরীরপাত করে, ক্লান্ত দেহেও তোমাদের বিরাম নেই? এবার এগিয়ে এল আর একটি মেয়ে, মানুষের মতো মাথা উঁচু করে বাঁচবার পথ পাব বলে এই রাজনীতিতে এসেছি, বলুন আর কত বেশি চাইব? এর থেকে বড় কী চাইতে পারি? আর কোনও পথ কি তা আমায় দিতে পারত?

একটু চুপ থেকে প্রৌঢ়ার অনুরোধ, তোমাদের এই কথাগুলি ভিডিওতে তুলতে চাই। আবার বলবে? এবার অবাক হওয়ার পালা দলের কর্মীদের। কেন? বললেন, আমার শ্বশুর মশাইকে দেখাব। তাঁর ৯০ বছর বয়স, এক সময় জ্যোতি বসুর সাথে রাজনীতি করেছেন। বামপন্থী রাজনীতির অবক্ষয় দেখে খুবই ব্যথা পান। আজকের ছেলেমেয়েরা এমন করে আদর্শের কথা বলছে শুনলে উনি শেষ বয়সে একটু শান্তি পাবেন। তাঁকে এই উপহারটুকু তোমাদের মাধ্যমে দিতে চাই।

তুললেন প্রচারের ভিডিও। কয়েকজন কর্মীর বক্তব্য রেকর্ড করলেন। এদের অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ-ডিগ্রির অধিকারী হয়েও কেরিয়ারের বদলে সর্বক্ষণের রাজনীতির পথই বেছে নিয়েছে শুনে তাঁর চোখে মুখে অদ্ভুত তৃপ্তি। যাবার সময় বলছেন, আমার ছেলে বিদেশে থাকে। স্বামীর সাথে আমিও মুম্বইয়ের বাসিন্দা। কলকাতায় এসেছি বৃদ্ধ শ্বশুরমশাইয়ের কিছুদিন দেখভাল করার জন্য। এখান থেকে যা নিয়ে গেলাম তা শুধু তাঁকে দেখাব তাই নয়, ছেলেকে আর স্বামীকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তিনি যেন বলতে চান— দেখ এমন ছেলে মেয়েরাও এদেশেই জন্মায়। সমস্যা ওদের হার মানাতে পারে না। ওদের এই মহৎ স্বপ্ন দেশটাকে বড় করবেই একদিন। বলে গেলেন, ‘ভরসা পেলাম’।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্থিক দুর্নীতির তদন্ত দাবি

উপাচার্যকে ডেপুটেশন দিল ডিএসও

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের বছরের পর বছর জমা পড়া টাকার কোনও হিসাব বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই। লক্ষ লক্ষ টাকার এই দুর্নীতিতে ছাত্রছাত্রী-অভিভাবক সহ উদ্বিগ্ন গোটা শিক্ষামহল। ঐতিহ্যশালী এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিপূর্বে ৭৮৬ কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগে ফিনান্স অফিসারকে সরিয়ে দিয়েছিল তৎকালীন কর্তৃপক্ষ।

নতুন করে আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সাতটি ক্যাম্পাসের বিভিন্ন খাতে জমা পড়া লক্ষ লক্ষ টাকার হিসাবে গরমিল ধরা পড়েছে। বারংবার এরূপ ঘটনা এবং বছরের পর বছর ছাত্রছাত্রীদের জমা দেওয়া টাকার এইভাবে হিসাবে অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার ঘটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের চূড়ান্ত গাফিলতি ও দায়িত্বজ্ঞানহীনতারই পরিচয়। এতে ছাত্রছাত্রীদের আস্থা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম নষ্ট হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে ৮ এপ্রিল ছাত্র সংগঠন এ আই ডি এস ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে ডেপুটেশন দিয়ে এই আর্থিক দুর্নীতির তদন্ত করে দোষীদের শাস্তির দাবি জানিয়েছে।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

প্রবীণ নেতা কমরেড রণজিৎ ধর অসুস্থ

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পলিটবুরোর প্রবীণ সদস্য কমরেড রণজিৎ ধর গত ২ এপ্রিল সল্টলেক পার্টি সেন্টারে হঠাৎ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর বয়স ৯০ বছর। এদিন তাঁর মূত্রনালী দিয়ে প্রবল রক্তক্ষরণ হতে থাকে। তৎক্ষণাৎ তাঁকে ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটালে ভর্তি করা হয়। ডাক্তার কমরেড অশোক সামন্তের নেতৃত্বে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক টিমের দ্বারা তাঁর চিকিৎসা শুরু হয়। ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, কিডনির রোগ, ইস্কিমিক হার্ট ইত্যাদি নানা রোগে তিনি ভুগছিলেন। ডাক্তার অশোক কুমার সামন্ত স্বাক্ষরিত এক মেডিকেল বুলেটিনে বলা হয়েছে, দ্রুত চিকিৎসায় তিনি আগের থেকে সুস্থ হয়েছেন। কিন্তু সম্পূর্ণ সুস্থ নন।

বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের সংবর্ধনা

৩১ মার্চ শিলিগুড়ি হার্ডওয়্যার মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন ভবনে ২০১৮ সালের প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদ আয়োজিত চতুর্থ শ্রেণির বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তরবঙ্গের সাতটি জেলার ১৪০ জন কৃতী ছাত্র-ছাত্রীকে সংবর্ধনা এবং বৃত্তি ও পুরস্কার প্রদান করা হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক ড. প্রদীপকুমার মণ্ডল। প্রধান অতিথি এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, যথাক্রমে কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের আইনজীবী শুভ্রাংশু চাকী এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক, শিক্ষক আন্দোলনের সপুরিচিত ব্যক্তিত্ব ড. তরুণকান্তি নস্কর। এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পর্ষদ কোষাধ্যক্ষ তপন সামন্ত, পর্ষদ সদস্য শংকর গাঙ্গুলী এবং অমল রায় প্রমুখ।

অধ্যাপক তরুণকান্তি নস্কর তাঁর বক্তব্যে আজকের দিনে শিক্ষার মানোন্নয়নের গুরুত্বের কথা উল্লেখ করে এই ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদ যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তার সাফল্য কামনা করেন।

তিনি তাঁর বক্তব্যে পূর্ববর্তী সরকারের ভুল সিদ্ধান্তের ফলে যে বৃত্তি পরীক্ষা ও পাশ-ফেল তুলে দেওয়া হয়েছে তার সমালোচনা করেন। কিন্তু পরিবর্তিত সরকার এখনও কেন পাশ-ফেল চালু করতে পারল না তাতে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেন। অন্য সকল বক্তা অবিলম্বে বৃত্তি পরীক্ষা ও পাশ-ফেল চালুর গুরুত্ব উল্লেখ করেন।

চিকিৎসকদের আন্দোলনের জয়

গত বছরের মতো এবারও রাজ্য সরকার নিট, পিজি কোয়ালিফায়েড এবং ৩ বছরের বেশি সময় ধরে চাকরিরত সরকারি চিকিৎসকদের একটা বিরাট অংশকে উচ্চশিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করতে ২৮ ফেব্রুয়ারি একটা নোটিস জারি করে বলে এ বছর ২৩৭ জনের বেশি কাউকে এমডি/এমএস পড়ার সুযোগ দেওয়া হবে না। যদিও গ্রামীণ হাসপাতাল স্তরে ৯০ শতাংশের বেশি বিশেষজ্ঞের পদ শূন্য পড়ে রয়েছে।

সরকার গ্রামীণ স্বাস্থ্য ব্যবস্থা উন্নয়নের যতই ফলাও প্রচার করুক, এ কথা আজ প্রমাণিত যে গ্রামীণ স্বাস্থ্য ব্যবস্থা আজ ভেঙে পড়ার ফলে গ্রাম থেকে প্রতিদিন হাজার হাজার রোগী রেফারর্ড হয়ে কলকাতায় আসতে বাধ্য হন।

গ্রামীণ স্বাস্থ্য ব্যবস্থার জন্য এ বছরে নিট, পিজি উত্তীর্ণ সরকারি ডাক্তারদের এমডি/ এমএস পড়ার সুযোগ দেওয়ার দাবিতে সার্ভিস ডক্টরস ফোরামের নেতৃত্বে বারবার ডাইরেক্টর অফ হেলথ সার্ভিসেস, ডাইরেক্টর অফ মেডিকেল এডুকেশন এবং প্রিন্সিপাল সেক্রেটারিকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। কিন্তু তাঁরা অনড় থাকায় অবশেষে এসডিএফ-এর নেতৃত্বে ১১৫ জন সদস্য আদালতের দ্বারস্থ হন।

ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইবুন্যাল (ডব্লিউবিএটি)-এর বিচারপতি সৌমিত্র পাল এবং মি. সুবেশ দাসের সামনে আইনজীবী প্রতীক ধর বলেন, 'সরকারি হিসাব অনুযায়ী যত সংখ্যক চিকিৎসক তিন বছর বা তার বেশি দিন ধরে চাকরি করছেন তার ১০ শতাংশের সমান ৪৬৬ বা তার বেশি হওয়ার কথা। কিন্তু স্বাস্থ্যভবন ২৩৭ জনের বেশি এ বছর ভর্তি হতে দেবে না এবং টিআর দেবে না। বিচারপতি সৌমিত্র পাল সরকারের ২৩৭ সংখ্যা নির্ধারণকে বেআইনি বলে চিহ্নিত করেন এবং এ বছর ভর্তির ক্ষেত্রে সমস্ত যোগ্য আবেদনকারীদের ভর্তি নেওয়ার জন্য এক অন্তর্বর্তী রায় দেন।

এসডিএফ-এর পক্ষ থেকে সাধারণ সম্পাদক ডাক্তার সজল বিশ্বাস এক বিবৃতিতে এই রায়কে স্বাগত জানিয়ে বলেন, 'আজকের এই রায় ঐতিহাসিক। এই জয় চিকিৎসকদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের জয়। সঠিক নেতৃত্বে জনস্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ দাবি নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করলে যে কোনও দাবি আদায় করা সম্ভব'।

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) প্রকাশিত নির্বাচন সংক্রান্ত এই মূল্যবান পুস্তিকাটি বাংলা, হিন্দি, ইংরেজি, উর্দু, কন্নড়, তামিল, তেলেগু, মালায়লম ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে

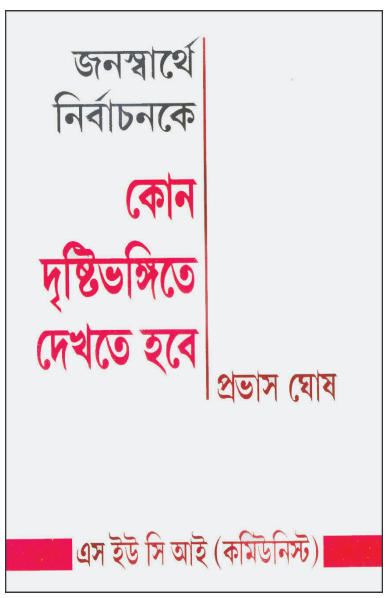

বাংলা

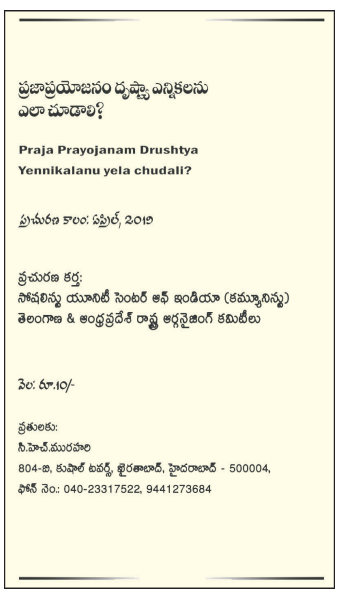

తెలేగు

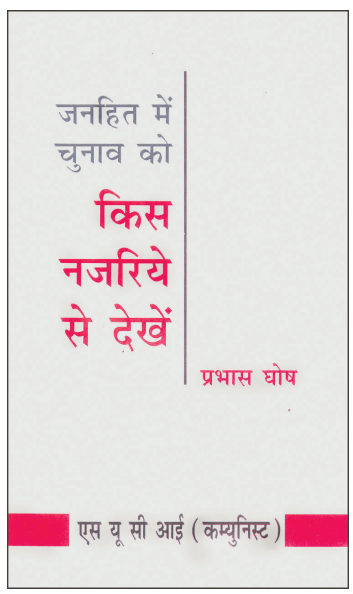

हिन्दि

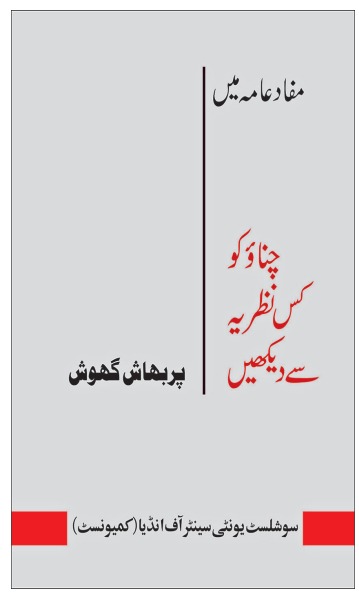

উর্দু

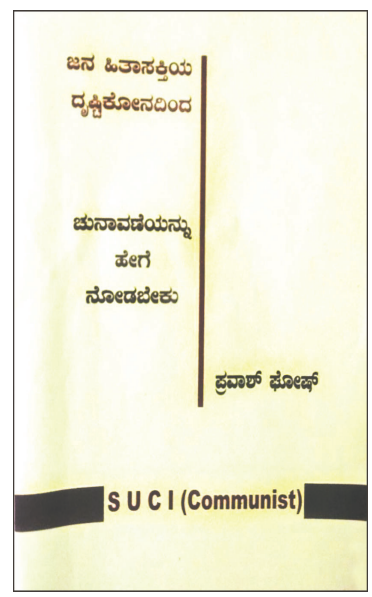

কন্নড়

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com